উন্মীলন

বার্ষিক ম্যাগাজিন ২০২০

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ ময়মনশাহী

বার্ষিক ম্যাগাজিন ২০২০

প্রচ্ছদ কথা

২০২০ সালে জাতি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। বার্ষিকীর নামকরণে ব্যবহৃত হয়েছে **'উন্মীলন'** শব্দটি, যার অর্থ হলো **'উন্মোচন', 'উন্মেষ', 'প্রস্ফুটন'**।

প্রচ্ছদের উপরের আলোক রশ্মির মাধ্যমে জাতির জনকের আদর্শের বিচ্ছুরণকে বুঝানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের গেইট, বিভিন্ন ভবন ও উর্ধ্বমুখী সিঁড়ি ধারণ করেছে যথাক্রমে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সোপান হিসেবে। যেখানে অবারিত জ্ঞান আহরণ ও অজানাকে জানার মধ্য দিয়ে অদম্য কৌতূহলী শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞানের চোখকে উন্মোচিত করে। প্রস্ফুটিত সূর্যমুখী ফুল দ্বারা প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম এবং ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী (সিপিএসসিএম) এর কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে সূর্যের মতো প্রস্ফুটনকে বুঝানো হয়েছে। তিনটি রং দ্বারা প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র-শান্তি, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেমকে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রচ্ছদের পেছনের অংশে রয়েছে ময়মনসিংহের প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন ও প্রতিষ্ঠানের অর্জন।

সার্বিক ভাবে বলা যায়, আকাশের মতো বিশালতা নিয়ে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের জগতে প্রথম চোখ মেলে তাকাতে শিখবে, অতঃপর শিক্ষার সোপান পেরিয়ে প্রতিযোগিতামূলক কর্মযজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হবে এবং প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র ও জাতির জনকের আদর্শে প্রকৃত দেশপ্রেমিক হয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। এ সবকিছুই বাস্তবায়নে সিপিএসসিএম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ইক্বরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক্ব

অনুবাদ

পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

সুরা আলাক্ব, আয়াত ১

উন্মীলন

বার্ষিক ম্যাগাজিন ২০২০

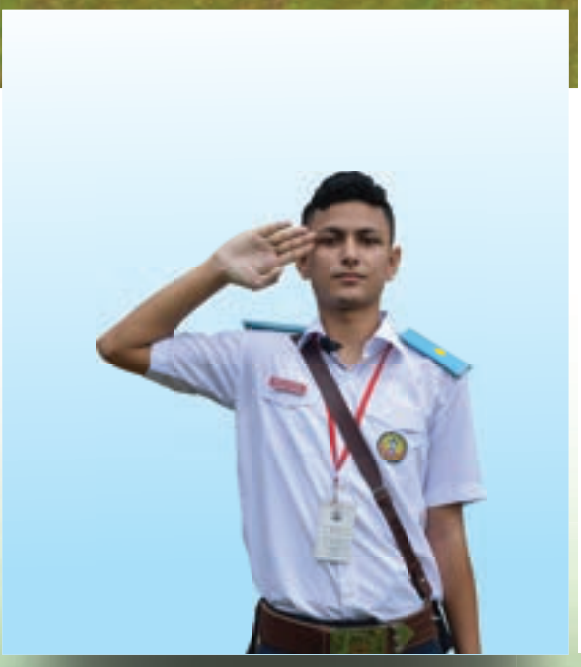

প্রাতঃকালীন সমাবেশ

প্রকাশনা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ১৯ পদাতিক ডিভিশন ও
এরিয়া কমান্ডার, ঘাটাইল এরিয়া

প্রধান উপদেষ্টা
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক, বিএসপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
কমান্ডার, ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড ও সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

উপদেষ্টা ও সম্পাদনা পর্ষদের সভাপতি
লেঃ কর্নেল মো. নাজিব মাহমুদ সজিব, পিএসসি, জি, আর্টিলারি
অধ্যক্ষ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

সম্পাদক
মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, প্রভাষক

সহ-সম্পাদক
মো. নূরুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক

সহযোগী সম্পাদক
বাংলা বিভাগ
সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু, সহকারী অধ্যাপক
হোসনে আরা জেছমিন, প্রভাষক
ফাতেমা খাতুন, সহকারী শিক্ষক
নাহিদা আফরোজ, সহকারী শিক্ষক
ফিরোজ, সহকারী শিক্ষক

ইংরেজি বিভাগ
সৈয়দ কাদিরুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক
সাবিনা ফেরদৌসি, প্রভাষক
মাসুদ রানা, সহকারী শিক্ষক
সিদ্দিকা আক্তার জাহান, সহকারী শিক্ষক
ফারিজা জামান, সহকারী শিক্ষক
জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী শিক্ষক

তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা
এম এ সায়েম, আইটি কর্মকর্তা
হাসান মাহমুদ, সহকারী শিক্ষক
মুহাম্মদ জানে আলম, প্রদর্শক

প্রকাশকাল
১ ডিসেম্বর ২০২০

প্রকাশক
লেঃ কর্নেল মো. নাজিব মাহমুদ সজিব,
পিএসসি, জি, আর্টিলারি
অধ্যক্ষ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

ফটোগ্রাফি ও অ্যালবাম প্রস্তুতকরণ
এমদাদুল হক, প্রভাষক
ফয়সল আহমেদ, প্রদর্শক
ছানাউল্লাহ, প্রদর্শক
স্বদেশ কুমার দত্ত, জুনিয়র শিক্ষক

অঙ্গসজ্জা
মাঈন উদ্দীন আহমেদ মাহী, সহকারী শিক্ষক
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান, সহকারী শিক্ষক
সুমাইয়া আফরিন আফসানা, সহকারী শিক্ষক

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান, সহকারী শিক্ষক

গ্রাফিক্স
মো. ইব্রাহিম খলিল বাবু

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি
আবু আলী সাকিক, দ্বাদশ শ্রেণি
স্মরণ সরকার, দ্বাদশ শ্রেণি
মো. ইশরাক আহসান খান নিসর্গ, দশম শ্রেণি
তানজিয়া আক্তার, দশম শ্রেণি

কম্পোজ
মো. রেজাউল করিম, কম্পিউটার অপারেটর
উত্তম কুমার পাল, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
মো. গোলাম সারোয়ার, কম্পিউটার অপারেটর
মো. মিজানুর রহমান, কম্পিউটার অপারেটর

কনসেপ্ট, ডিজাইন ও মুদ্রণ
অর্নেট কেয়ার, ৮৭, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯১১৫৪৬৬১৩

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় মুজিববর্ষের চেতনাকে ধারণ করে নিজস্ব স্বকীয়তায় এই বছরও বার্ষিক ম্যাগাজিন **'উন্মীলন-২০২০'** প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত।

একটি বার্ষিকী যেমন প্রতিষ্ঠানের খুদে কলম যোদ্ধাদের চিন্তাধারার সৃজনশীল বহিঃপ্রকাশে সহায়তা করে তেমনি এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান ও শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের সাক্ষরও প্রতিফলিত করে। জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাই পারে একজন মানুষের সামাজিক মুল্যবোধ ও মননশীলতাকে উজ্জীবিত করতে। বার্ষিক ম্যাগাজিন **'উন্মীলন-২০২০'** কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের পরিস্ফুটনের যে সুযোগ করে দিয়েছে তা ভবিষ্যতে তাদের একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে বলে আমি আশাবাদী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজকের নতুন প্রজন্মকে যেমন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে ঠিক তেমন ভাবে তাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে দেশীয় শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায়। কেননা দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চাই নতুন প্রজন্মকে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। আর তখনই এই নতুন প্রজন্ম আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণের কারিগর হিসেবে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে।

আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি 'ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী' এর কোমলমতি শিক্ষার্থীদের যাদের স্ব স্ব সাহির্ত্যকর্ম, চিএকর্ম ও নানারূপ শৈল্পিক সৃষ্টির আবহে বার্ষিক **'উন্মীলন-২০২০'** নতুন রূপে উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। এছাড়াও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এই প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি, অধ্যক্ষ এবং বার্ষিকী প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় কমিটি এবং অন্যান্য সকলকে যাঁদের মেধা-মনন ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এটি পূর্ণতা লাভ করেছে।

পরিশেষে প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের সহায় হোন।

মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ১৯ পদাতিক ডিভিশন ও
এরিয়া কমান্ডার, ঘাটাইল এরিয়া
এবং
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

সভাপতির বাণী

সূচনালগ্ন থেকে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী শিক্ষা কার্যক্রম সুনিপুণ ভাবে পরিচালনার পাশাপাশি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করে দ্যুতি ছড়িয়ে আসছে । এরই ধারাবাহিকতায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করার প্রয়াসে বার্ষিক সাময়িকী 'উন্মীলন'-২০২০ প্রকাশনার মহতী উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বার্ষিক সাময়িকী শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও মননশীলতা বিকাশের একটি অন্যতম ক্ষেত্র, যাতে মূর্ত হয়ে ওঠে একটি প্রতিষ্ঠানের শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি। শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে কেবল পাঠ্যপুস্তক নির্ভর শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীদের মনের গহীনে সুপ্ত সম্ভাবনার স্ফুটনের সুযোগ তৈরিতে বার্ষিকী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লেখালেখির মধ্য দিয়ে খুদে শিক্ষার্থীরা সৃষ্টির আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হবে। বড় হয়ে তারাই একদিন প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিক হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করবে বলে আমি আশাবাদী।

বিদ্যায়তনের এই বার্ষিকী বছরব্যাপী বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য দলিলও বটে। এতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের অভিব্যক্তিগুলো ফুটে ওঠে অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও গুণগতমানের সার্বিক পরিচয়ও প্রকাশ পায়। যাদের লেখা ও অঙ্কন ধারণ করে 'উন্মীলন'-২০২০ এর গৌরবদীপ্ত প্রকাশ ঘটেছে সে সকল কচিপ্রাণ নবীন সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের জানাই অভিনন্দন। সত্য ও সুন্দরের জয়গানে মুখরিত শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক, বিএসপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
কমান্ডার, ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড ও স্টেশন কমান্ডার, ময়মনসিংহ সেনানিবাস
এবং
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

অধ্যক্ষের বাণী

শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি জাতির স্বরূপ অন্বেষার গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। কারণ শিক্ষা একটি জাতির অবয়ব নির্মাণ করে, সাহিত্যে সে অবয়বের প্রতিফলন ঘটে আর সংস্কৃতি তাকে পূর্ণতা দান করে। তাই শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মহতী উদ্দেশ্যে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর উদ্যোগে প্রকাশিত হলো বার্ষিক ম্যাগাজিন 'উন্মীলন'-২০২০।

মানব হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি যেহেতু সাহিত্যের মূল উপজীব্য সেহেতু সাহিত্যে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এ সাধনায় স্বার্থকতা লাভ করার জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা অপরিহার্য। এর মাধ্যমে সমাজ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। জীবনকে আদর্শ, সুন্দর, সুশোভিত ও মূল্যবোধের উপলব্ধিতে সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মননশীল সাহিত্য চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তার জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটায়। বার্ষিকী একটি বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীদের মুক্তচিন্তা এবং মেধা-মননের সুবিন্যস্ত দর্পণ। এর মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা পায় অবাধ সৃজনশীল চিন্তা ও মেধা বিকাশের সুযোগ এবং জড়তার অভিব্যক্তি থেকে মুক্তি। আমি বিশ্বাস করি 'উন্মীলন'-২০২০ শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে সৃষ্টিশীল প্রতিভার উন্মেষ সাধন করবে এবং তাদের আত্মপ্রত্যয়ের উন্মেষ ঘটাবে। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি মুক্তবুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে ভবিষ্যতের আলোকিত মানুষ তৈরি করতে 'উন্মীলন'-২০২০ এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এ আমার প্রত্যাশা।

যাদের লেখায়, রঙে ও কর্মযজ্ঞে 'উন্মীলন' এর পাতাগুলো অর্থবহ হয়ে উঠেছে তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যাঁদের উদ্যমী ও যথোচিত দিক নির্দেশনা এ প্রকাশনাকে করেছে সার্থক। যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে 'উন্মীলন'-২০২০ প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

উন্মীলিত হোক আমাদের স্বপ্নসমূহ, সত্য ও সুন্দরের আলোয় উদ্ভাসিত হোক সিপিএসসিএম পরিবারের পথ চলা। সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা।

লেঃ কর্নেল মো. নাজিব মাহমুদ সজিব, পিএসসি, জি, আর্টিলারি
অধ্যক্ষ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

সম্পাদকীয়

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী পরিবারের বছরব্যাপী সৃজনশীলতার নিয়মিত দর্পণ 'উন্মীলন'। 'উন্মীলন'-২০২০ সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব এবার আমার কাঁধে পড়ায় বছরের শুরুতেই উদ্যম নিয়ে কাজ শুরু করে দেই। এ বছরটা শুরু হয়েছিল উৎসবমুখরতা নিয়ে। কারণ এবছর বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবর্ষ। জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখ থেকেই শুরু হয়েছিল মুজিববর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণ গণনা। আমাদের শিক্ষার্থীরাও উন্মীলনের পাতাগুলো ভরিয়ে তুলতে ভীষণ আগ্রহী ছিল। আর তা আমার কাজকে সহজ করে দিয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই উন্মীলনের জন্য পর্যাপ্ত লেখা ও ছবি হাতে এসে গেল। এবার আমার সম্পাদনার কাজ শুরু। কিন্তু না, সূচনাতেই থমকে যেতে হলো। যেন কোনো অচেনা গ্রহ থেকে দৈত্য এসে বলল, 'থামো'। অচলায়তনে পরিণত হল সারা বিশ্ব। সেই সর্বনাশা দৈত্যের নাম COVID-19. এরই থাবা থেকে বাঁচার জন্য আমরা বেছে নিলাম সঙ্গনিরোধ কৌশল। হয়ে পড়লাম গৃহে অবরুদ্ধ। গৃহবন্দি জীবনে প্রযুক্তির কল্যাণে খুলে গেল যোগাযোগের নতুন জানালা। এই অপ্রশস্ত জানালা দিয়ে যতটুকু আলো পাওয়া যায়, তাতেই আবারও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা।

আনন্দের সাথেই জানাতে চাই এবার উন্মীলনের কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। তারপরও আমরা সবার লেখাকে ঠাঁই দিতে পারিনি। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা তাদের অন্তরের সুপ্ত ভাবনাগুলোকে উন্মীলিত করেছে কবিতা, গল্প, ছড়া, প্রবন্ধ, কৌতুক রচনার মধ্য দিয়ে। আরো একটি বিষয় না বললেই নয়-শিক্ষার্থীদের নবীন হাতের লেখাগুলোয় সম্পাদকের কলম আঁচড় কাটেনি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে কোমলপ্রাণ শিশুদের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ও সুষ্ঠু বিকাশে পরিচর্যা দেয়া। লেখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবিও বার্ষিকীতে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও আমরা চেষ্টা করেছি আলোক চিত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সারা বছরের সচিত্র কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে।

প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয় বাণী প্রদানের মাধ্যমে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়ের সার্বিক সহযোগিতা বার্ষিকী প্রকাশে গতিময়তা এনেছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা সম্পাদনা পর্ষদ এর কাজকে করেছে সহজতর। শিক্ষকমণ্ডলী লেখা দিয়ে এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সম্পাদনা পর্ষদের সকলের শ্রম ও নিষ্ঠায় এই প্রকাশনা আলোর মুখ দেখেছে। এছাড়াও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সহায়তা দিয়েছেন অনেকেই। সকলের অবদান অশেষ কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি।

পৃথিবীর গভীর অসুখের দিনে সব প্রতিবন্ধকতাকে দূরে ঠেলে পরম করুণাময়ের কৃপায় আমরা বার্ষিকী প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। সম্পাদনা পর্ষদের নিরন্তর সতর্কতা সত্ত্বেও মুদ্রণজনিত কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে। আশা করি পাঠকের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মার্জনা থেকে বঞ্চিত হব না। আমাদের সমন্বিত কর্মোদ্যোগ পাঠকের চিত্তকে পরিতৃপ্ত করবে এই আমাদের প্রত্যাশা।

মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন
প্রভাষক, বাংলা

উপদেষ্টা ও সম্পাদনা পর্ষদ

পরিচালনা পর্ষদ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক
বিএসপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
কমান্ডার, ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড ও স্টেশন কমান্ডার, ময়মনসিংহ সেনানিবাস
সভাপতি

মেজর খালেদ আহমদ
স্টেশন স্টাফ অফিসার
ময়মনসিংহ সেনানিবাস
সদস্য

মেজর মিঞা মোহাম্মদ ফখরউদ্দিন আলী মাঝলবী
জিএসও-২ (শিক্ষা), ১৯ পদাতিক ডিভিশন,
শহীদ সালাহউদ্দিন সেনানিবাস, ঘাটাইল
সদস্য

মেজর ফারজানা হক
জিএসও-২ (শিক্ষা), ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড,
ময়মনসিংহ সেনানিবাস
সদস্য

সুমনা আল মজীদ
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার,
ময়মনসিংহ সেনানিবাস
সদস্য

খন্দকার মাহবুব আলম
সিআইপি, অভিভাবক প্রতিনিধি,
কলেজ শাখা
সদস্য

ডাঃ জাকির হোসেন খান
কমিউনিটি বেজড মেডিকেল কলেজ
অভিভাবক প্রতিনিধি
স্কুল শাখা
সদস্য

ফারহানা ফেরদৌস
সহকারী অধ্যাপক, আনন্দমোহন কলেজ
মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি
স্কুল শাখা
সদস্য

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী
প্রভাষক, শিক্ষক প্রতিনিধি
কলেজ শাখা
সদস্য

রোকসানা বেগম
সিনিঃ শিক্ষক, শিক্ষক প্রতিনিধি,
স্কুল শাখা
সদস্য

লেঃ কর্নেল মো. নাজিব মাহমুদ সজিব
পিএসসি, জি, আর্টিলারি
অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব

হাউস পরিচিতি

ঈশা খাঁ হাউস

কোনো যুদ্ধে পরাজয় না মানা বাংলার এক অকুতোভয় জমিদারের নাম ঈশা খাঁ। ১৫০০ শতাব্দীতে মোগল আমলে বাংলা ছিল একটি পরগণা যা শাসন করত ১২জন স্বাধীন জমিদার এবং তাঁরা ইতিহাসে বার ভূঞা নামে পরিচিত। আর এই বার ভূঞার নেতা ছিলেন ঈশা খাঁ। তাঁর জমিদারির রাজধানী ছিল সোনার গাঁ এবং কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জের জঙ্গলবাড়িতে। গাজিপুরের কালিগঞ্জের বক্তারপুরে তিনি দুর্গ স্থাপন করেছিলেন। বীরত্ব ও ন্যায় পরায়ণতার জন্য খ্যাত ঈশা খাঁ মোগলদের বশ্যতা স্বীকার না করায় তাঁকে দমন করার জন্য মোগল সম্রাট আকবর একাধিকবার সৈন্যবাহিনী পাঠালেও বীর ঈশা খাঁর কাছে তারা পরাজিত ও বন্দি হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সড়াইল পরগণায় ১৫৩৭ সালে ঈশা খাঁর জন্ম। তার পিতা সোলাইমান খাঁর কাছ থেকে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সড়াইল পরগণা ও পূর্ব মোমেনশাহী অঞ্চলের জমিদারি লাভ করেন। বাবার পর ঈশা খাঁ নিজেকে একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ও যোগ্য জমিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। সোনার গাঁ থেকে জঙ্গলবাড়ি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সড়াইল থেকে রংপুর পর্যন্ত ছিল ঈশা খাঁর জমিদারি। ১৫৯৭ সালে ৫ সেপ্টেম্বর বিক্রমপুর হতে ১২ মাইল দূরে ঈশা খাঁ, মাসুম খাঁ ও কাবুলির সম্মিলিত বাহিনী দুর্জনসিংহের মোগল বাহিনীকে বাধা দিলে মানসিংহের ছেলে দুর্জনসিংহ বহু সৈন্যসহ নিহত হন। পরে ঈশা খাঁ মোগল সম্রাট আকবরের সাথে সমঝোতা করলে সম্রাট তাঁকে 'দেওয়ান' ও 'মসনদী আলা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৫৯৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এই মহান শাসক গাজিপুরের কালিগঞ্জের বক্তারপুরে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। বাংলার এই বীর যোদ্ধা ও ময়মনসিংহের ভূতপূর্ব জমিদার ঈশা খাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই হাউসের নামকরণ করা হয় ঈশা খাঁ হাউস।

হাউস মাস্টার
মো. মারফত আলী
সহকারী অধ্যাপক

হাউস পরিচিতি

নজরুল হাউস

বাংলা সাহিত্যের ধ্রুবতারা, সাম্যবাদী চেতনার কাণ্ডারী কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন-সংগ্রামে রুটির দোকানে কর্মচারী থেকে শুরু করে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বাংলা পল্টনে সৈনিক হিসেবে কাজ করে অত্যাচার, শোষণ ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী দর্শন তিনি লালন করেছেন, তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর অনেক কবিতা ও গানে। পিতা কাজী ফকির আহমেদ ও মাতা জাহেদা খাতুনের অভাবের সংসারে নজরুলের জন্ম। মাত্র সাত বছর বয়সে যখন তার পিতাকে হারান, তখন তাঁকে উপার্জনে নামতে হয়। সেই বন্ধুর পথে হাঁটতে হাঁটতে নজরুল শুধু মেহনতি সাধারণ মানুষের জীবনকেই দেখেননি, অবলোকন করেছেন মানুষের প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ ও মমতা। তাইতো তিনি যেমন বিদ্রোহের ও সাম্যের কবি, তেমনি প্রেম ও ভক্তির কবি। মাত্র ৪৩ বছরের সুস্থ জীবনে নজরুল সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণ করেছেন। গান রচনা, কবিতা লেখা, গদ্য, প্রবন্ধ, গল্প এমনকি নাটকও তিনি রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন বাঙালি প্রথম চলচ্চিত্রকার। তাঁর প্রযোজনায় 'ধূপছায়া' চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। পত্রিকা সম্পাদনা থেকে শুরু করে চলচ্চিত্রে অভিনয় পর্যন্ত করেছেন তিনি। তার সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' পত্রিকার জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন

"কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু
আয় চলে আয়রে ধূমকেতু
আধাঁরে বাঁধ অগ্নি সেতু, দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।"

এই প্রেম ও দ্রোহের কবি মাত্র ৪৩ বছর বয়সে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে নিস্তব্ধ হয়ে যান। কবি ১৯৭৬ সালে ২৯ আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। এই মহান সাধকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে নজরুল হাউসের নামকরণ করা হয়েছে।

হাউস মাস্টার
নাহিদ আরা
সহকারী অধ্যাপক

হাউস পরিচিতি

জয়নুল হাউস

জয়নুল আবেদিন বিংশ শতাব্দীর একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাঙালি চিত্রশিল্পী। পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে চিত্রশিল্প বিষয়ক শিক্ষার প্রসারে আমৃত্যু প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে 'শিল্পাচার্য' উপাধি দেয়া হয়। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে 'দুর্ভিক্ষচিত্রমালা', 'সংগ্রাম', 'সাঁওতাল রমণী', 'ঝড়', 'কাক', 'বিদ্রোহী' ইত্যাদি। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে গ্রাম বাংলার উৎসব নিয়ে আঁকেন তাঁর বিখ্যাত ৬৫ ফুট দীর্ঘ ছবি 'নবান্ন'। জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কেন্দুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা তমিজউদ্দীন আহমেদ ও মা জয়বুন্নেসার বড় সন্তান জয়নুল আবেদিনের ছেলেবেলা থেকেই চিত্রকলার প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। সাধারণ পড়াশুনায় আগ্রহ না থাকায় মায়ের সহযোগিতায় ১৯৩৩ সালে কোলকাতা গভার্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস-এ ভর্তি হন। ১৯৩৮ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে ড্রইং ও পেইন্টিং এ প্রথম শ্রেণিতে ১ম হয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলায় একটি চিত্রকলা স্কুলের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ঢাকার জনসন স্ট্রিটে ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলের জীর্ণ কক্ষে জয়নুল আবেদিনের উদ্যোগে একটি সরকারি আর্ট ইনিস্টিটিউট স্থাপিত হয়। পর্যায়ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে শাহাবাগের বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়, যা বর্তমানে বাংলাদেশ আর্টস ইনিস্টিটিউট নামে পরিচিত। তিনি ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার জন্য জয়নুল আবেদিন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত চিত্র কর্মগুলোর মধ্যে ১৯৬৯ এর 'সংগ্রাম', ১৯৭৫ এ 'নৌকা' এবং ১৯৭১ এ 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' ও 'ম্যাডোনা' উল্লেখ করা যায়। তাঁর দীর্ঘ দুইটি স্ক্রল 'নবান্ন' ও 'মনপুরা ৭০' নামকরা চিত্রকর্ম। তিনি চিত্রকর্মের চেয়ে চিত্রকলা শিক্ষা প্রসারে বেশি সময় দিয়েছেন। তাঁর আগ্রহে সরকার সোনারগাঁয়ে লোকশিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করে এবং ময়মনসিংহে জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করে তাঁর শিল্পকর্ম সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মনে করা হয় তাঁর চিত্রকর্মের সংখ্যা প্রায় ৩০০০টি। তাঁর নামে আর্টস ইনিস্টিটিউটে 'জয়নুল আবেদিন গ্যালারী' ও জাতীয় যাদুঘরের একটি কক্ষকে 'জয়নুল আবেদিন চিত্রশালা' হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। তিনি দেশে ও বিদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭৪ সালে তাঁকে প্রথম জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৬ সালের ২৮ মে মাত্র ৬২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শিল্পীগুরু জয়নুল আবেদিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই হাউসের নামকরণ করা হয়েছে জয়নুল হাউস।

হাউস মাস্টার
মো. ইনামুল হক
সহকারী অধ্যাপক

নান্দনিকতায়
সিপিএসসিএম

মেধা বিকাশে হাতে কলমে শিক্ষা

জীববিদ্যা ল্যাব

রসায়ন ল্যাব

আইসিটি ল্যাব
কলেজ

লাইব্রেরি

পদার্থ ল্যাব

আইসিটি ল্যাব
স্কুল

দেশপ্রেমের শপথে উজ্জীবিত

বিএনসিসি, বয়েস স্কাউট, গার্লস গাইড ও রোভার স্কাউট

বিএনসিসি প্লাটুন

বয়েস স্কাউট দল

গার্লস গাইড দল

রোভার স্কাউট দল

সোসাইটি কার্যক্রম

বাংলা উচ্চারণ সোসাইটি

জীববিজ্ঞান সোসাইটি

রসায়ন সোসাইটি

নৃত্য সোসাইটি

পদার্থবিজ্ঞান সোসাইটি

ডিবেট সোসাইটি

চিত্রাঙ্কন সোসাইটি

বাস্কেটবল
সোসাইটি

কম্পিউটার
সোসাইটি

ক্রিকেট
সোসাইটি

ইংলিশ
ল্যাঙ্গুয়েজ
সোসাইটি

দাবা
সোসাইটি

সংগীত
সোসাইটি

অভিনয়
সোসাইটি

প্রিফেক্ট

সেন্ট্রাল

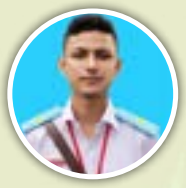

আবু আলী শাকীক
কলেজ ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- এ

সানজিদা আফরিন সিয়াম
কালচারাল ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- এ

আশরা আনিকা তানহা
সহ: ক্যাপ্টেন (কলেজ)
একাদশ, শাখা- এফ

আফিফা হেনা মুন
সহ: কালচারাল ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা-এফ

স্মরণ সরকার
স্পোর্টস ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- এ

মো. আল মামুন সাকিব
সহ: ক্যাপ্টেন (স্কুল)
দশম, শাখা-ই

সাদাত আল হাবীব সৌরভ
সহ: স্পোর্টস ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- জি

ঈশাখাঁ

মো. মাহমুদুল হাসান তূর্য
হাউস ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- জি

কামরুন্নাহার রিজকুন
কালচারাল ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- এ

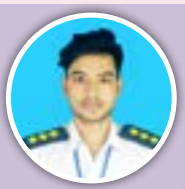

ফাতেমা তুজ জোহরা শিফা
সহ: হাউস ক্যাপ্টেন
(কলেজ)
একাদশ, শাখা- এ

শানজিদা ইয়াসমিন
সহ: কালচারাল ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা-এফ

আরিফ খান জয়
স্পোর্টস ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- জি

নাফিস সাদিক রাতিন
সহ: হাউস ক্যাপ্টেন (স্কুল)
দশম, শাখা- বি

মো. নাইমুর রহমান ইমন
সহ: স্পোর্টস ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- জি

নজরুল

সাজিদ আহসান সিয়াম
হাউস ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- এ

রোহিত সেন
কালচারাল ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- ই

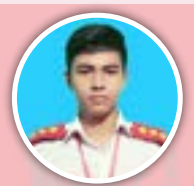

সুরাইয়া আলি
সহ: হাউস ক্যাপ্টেন
(কলেজ)
একাদশ, শাখা- এ

ইসরাত জাহান কেয়া
সহ: কালচারাল ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- বি

সিমসন কুবি
স্পোর্টস ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- ই

আবিদ রহমান অভি
সহ: হাউস ক্যাপ্টেন (স্কুল)
দশম, শাখা- এফ

নিশাদ হাসান রাছিফ
সহ: স্পোর্টস ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- আই

জয়নুল

রাইয়ান বসীর
হাউস ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- ই

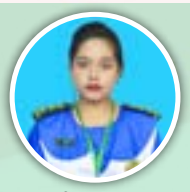

ফাতিন ফুয়াদ সাবির
কালচারাল ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- এ

ফারিহা জালাল
সহ: হাউস ক্যাপ্টেন
(কলেজ)
একাদশ, শাখা- বি

রাকিবুন নাহার ইফা
সহ: কালচারাল ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- বি

মো. সাকিব আমিন
স্পোর্টস ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- এ

রাকিবুল হাসান
সহ: হাউস ক্যাপ্টেন (স্কুল)
দশম, শাখা- এ

নিসার আহমেদ
সহ: স্পোর্টস ক্যাপ্টেন
একাদশ, শাখা- আই

অনুষদ সদস্যবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষ

অনুষদ সদস্যবৃন্দের পরিচিতি, কলেজ শাখা

লেঃ কর্নেল মো. নাজিব মাহমুদ সজিব
অধ্যক্ষ

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান
প্রভাষক, গণিত ও কলেজ কো-অর্ডিনেটর

সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা

মুহাম্মদ আহসান হাবীব
সহকারী অধ্যাপক, গণিত

মো. শাহীদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান

নাহিদ আরা
সহকারী অধ্যাপক, জীববিজ্ঞান

মো. ইনামুল হক
সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান

সৈয়দ কাদিরুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি

মো. মারফত আলী
সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম

এস.এম.জাহিদুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, জীববিজ্ঞান

মো. তারিকুল গণি
প্রভাষক, ইংরেজি

গৌতম চন্দ্র দাম
প্রভাষক, আইসিটি

মো. মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী
প্রভাষক, রসায়ন

অনুষদ সদস্যবৃন্দের পরিচিতি, কলেজ শাখা

নাসরিন পারভীন
প্রভাষক, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

আব্দুল বাতেন
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান

হোসনে আরা জেছমিন
প্রভাষক, বাংলা

এমদাদুল হক
প্রভাষক, অর্থনীতি

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী
প্রভাষক, আইসিটি

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান
প্রভাষক, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন

মো. আবু সাঈদ
প্রভাষক, পৌরনীতি ও সুশাসন

সাবিনা ফেরদৌসি
প্রভাষক, ইংরেজি

মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন
প্রভাষক, বাংলা

আনজুমান আরা
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান

কামরুন নাহার হাসিনা
প্রভাষক, ইংরেজি

সোহেল মিয়া
প্রভাষক, গণিত

রুবীনা আজাদ
প্রভাষক, বাংলা

মো. আনিসুজ্জামান রানা
প্রভাষক, রসায়ন

সুলতান আহমেদ
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মো. মশিউর রহমান
প্রভাষক, আইসিটি

অনুষদ সদস্যবৃন্দের পরিচিতি, কলেজ শাখা

মো. নাজমুল হক মিজান
প্রভাষক, রসায়ন

মো. মোমিনুল ইসলাম
প্রভাষক, কৃষি শিক্ষা

আব্দুস সবুর মোল্যা
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান

মো. জাহিদুল ইসলাম
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

মো. মাহমুদুল হাসান
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

নোমানা নাহিদ
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান

মোহাম্মদ রহমত আলী
প্রদর্শক, পদার্থবিজ্ঞান

মো. টিপু সুলতান
শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

ফয়সল আহমেদ
প্রদর্শক, রসায়ন

মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান
সহকারী গ্রন্থাগারিক

ছানাউল্লাহ
প্রদর্শক, আইসিটি

অনুষদ সদস্যবৃন্দের পরিচিতি, স্কুল শাখা

ইলিয়াছ খান
সহকারী প্রধান শিক্ষক

মো. নূরুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক

রেহানা সুলতানা
সিনিয়র শিক্ষক

রুবাইদা বিন্‌তে রহমান
সিনিয়র শিক্ষক

মো. আবদুল অহিদ
সিনিয়র শিক্ষক

শিরীন আক্তার
সিনিয়র শিক্ষক

এ কে এম শহীদ সারওয়ার
সিনিয়র শিক্ষক

মো. ইমতিয়াজ
সিনিয়র শিক্ষক

মো. নূরুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

নয়ন তারা
সিনিয়র শিক্ষক

সোহাগ মনি দাস
সিনিয়র শিক্ষক

রোকসানা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক

ইলোরা ইমাম সম্পা
সিনিয়র শিক্ষক

অনুষদ সদস্যবৃন্দের পরিচিতি, স্কুল শাখা

ফাতেমা উম্মে রায়হান
সিনিয়র শিক্ষক

ফৌজিয়া বেগম
সিনিয়র শিক্ষক

রোমানা হামিদ
সিনিয়র শিক্ষক

এম এ বারী রব্বানী
সিনিয়র শিক্ষক

মো. ওমর ফারুক
সিনিয়র শিক্ষক

মুহাম্মদ কামাল হোসাইন
সিনিয়র শিক্ষক

মাহবুবা নুরুন্নেছা
সিনিয়র শিক্ষক

জুলেখা আখতার
সিনিয়র শিক্ষক

মোহাম্মদ ফারুক মিঞা
সিনিয়র শিক্ষক

খালেদা বেগম
সহকারী শিক্ষক

মো. সিরাজুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

ফাতেমা খাতুন
সহকারী শিক্ষক

একেএম খায়রুল হাসান আকন্দ
সহকারী শিক্ষক

মো. মনোয়ার হোসেন
সহকারী শিক্ষক

মাসুদ রানা
সহকারী শিক্ষক

আব্দুর রহমান
সহকারী শিক্ষক

অনুষদ সদস্যবৃন্দের পরিচিতি, স্কুল শাখা

মাঈন উদ্দীন আহামেদ মাহী
সহকারী শিক্ষক

সিদ্দিকা আক্তার জাহান
সহকারী শিক্ষক

ফারিজা জামান
সহকারী শিক্ষক

সঞ্জয় বিশ্বাস
সহকারী শিক্ষক

আ ন ম মাহমুদুল হাসান
সহকারী শিক্ষক

মো. লিয়াকত আলী খান
সহকারী শিক্ষক

মো. মাজাহারুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

ফজলে মাসুদ
সহকারী শিক্ষক

মো. আল আমিন
সহকারী শিক্ষক

কে. এ. এম রাশেদুল হাসান
সহকারী শিক্ষক

মৌমিতা তালুকদার
সহকারী শিক্ষক

মো. আমিরুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

কাজী সুম্মন প্রিয়া
সহকারী শিক্ষক

সুমাইয়া আফরিন আফসানা
সহকারী শিক্ষক

বিদ্যুৎ তরফদার
সহকারী শিক্ষক

মো. মাহবুব রহমান ফকির
সহকারী শিক্ষক

অনুষদ সদস্যবৃন্দের পরিচিতি, স্কুল শাখা

মো. শাহজালাল মিয়া
সহকারী শিক্ষক

খন্দকার মৌসুমী নাসরিন
সহকারী শিক্ষক

স্বপ্না রানী দাস
সহকারী শিক্ষক

হাসান মাহমুদ
সহকারী শিক্ষক

মো. সেলিম উদ্দিন
সহকারী শিক্ষক

জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী শিক্ষক

সাহিদা আক্তার
সহকারী শিক্ষক

জুয়েনা জাহান এ্যানি
সহকারী শিক্ষক

নাহিদা আফরোজ
সহকারী শিক্ষক

ফিরোজ
সহকারী শিক্ষক

সাবিহা রহমান
সহকারী শিক্ষক

শামস বিন বনি আমিন
সহকারী শিক্ষক

মো. সুজন মিয়া
সহকারী শিক্ষক

মো. আমিনুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

রেহানা পারভীন
সহকারী শিক্ষক

মুহাম্মদ জানে আলম
প্রদর্শক

অনুষদ সদস্যবৃন্দের পরিচিতি, স্কুল শাখা

রোকসানা পারভীন
সহকারী শিক্ষক

মো. নজরুল ইসলাম-১
সহকারী শিক্ষক

মো. আরাফাত হোসেন
সহকারী শিক্ষক

মাহাবুবা আফরোজ
জুনিয়র শিক্ষক

মো. জসিম উদ্দিন
জুনিয়র শিক্ষক

আয়েশা আক্তার রুমা
জুনিয়র শিক্ষক

মো. নজরুল ইসলাম-২
জুনিয়র শিক্ষক

স্বদেশ কুমার দত্ত
জুনিয়র শিক্ষক

রওশন আরা
জুনিয়র শিক্ষক

অরুপা ঠাকুর শিল্পী
জুনিয়র শিক্ষক

মো. মঞ্জুরুল হক
জুনিয়র শিক্ষক

এনায়েত উল্লাহ
জুনিয়র শিক্ষক

ফাহিমা নাছরিন
জুনিয়র শিক্ষক

মো. সাইফুল ইসলাম সুজন
জুনিয়র শিক্ষক

মো. আবু জাকারিয়া
জুনিয়র শিক্ষক

রুমানা ইফফাত
জুনিয়র শিক্ষক

প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী

এম এ সায়েম
আইটি কর্মকর্তা

এম. এন তামান্না
কাউন্সেলিং এন্ড এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট

সিনিঃ ওয়াঃ অফিঃ (অবঃ) মো. মতিউর রহমান
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মো. হাবিবুর রহমান
অফিস সুপারিনটেনডেন্ট

সার্জেন্ট (অবঃ) মো. মীর হোসেন
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা (এডমিন-২)

সার্জেন্ট (অবঃ) মো. আজিজুল হক
হিসাবরক্ষক

উত্তম কুমার পাল
ডাটা এন্ট্রিঃ অপারেটর

আল মুনসুরুল হক
পিএ

মো. আকরাম আলী
হিসাব সহকারী কাম কম্পিঃ অপারেটর

মো. জহিরুল হক
হিসাব সহকারী কাম কম্পিঃ অপারেটর

মো. মোজাম্মেল হক
ড্রাইভার

মো. রেজাউল করিম
নিম্নমান সহঃ কাম কম্পিঃ অপারেটর

মো. হারুন অর রশিদ
স্টোর কিপার

মো. গোলাম সারোয়ার
নিম্নমান সহঃ কাম কম্পিঃ অপারেটর

মো. আব্দুল আউয়াল
ফটোকপি মেশিন অপারেটর

মো. মিজানুর রহমান
নিম্নমান সহঃ কাম কম্পিঃ অপারেটর

প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী

মো. আবু বকর সিদ্দিক
নিম্নমান সহঃ কাম কম্পিঃ অপারেটর

মো. নাছির উদ্দিন শিকদার
ইলেকট্রিশিয়ান

মো. মশিউর রহমান
নিম্নমান সহঃ কাম কম্পিঃ অপারেটর

সার্জেন্ট (অবঃ) মো. জাকির হোসেন
ড্রাইভার

মাসুদুল আলম
প্রশাসনিক সহকারী

কর্পোঃ (অবঃ) মো. আবদুল আউয়াল
ড্রাইভার

মো. ইমন হোসেন
ড্রাইভার

সাগরিকা সরকার অরুনা
মেডিকেল এসিসট্যান্ট

আইরিন সুলতানা
শিক্ষক সহ:/লাইব্রেরি সহকারী

অপরাজিতা গন্ড
শিক্ষক সহকারী

নাজমা খাতুন
শিক্ষক সহকারী

আসমা খাতুন
শিক্ষক সহকারী

চিনু রাণী সিংহ
শিক্ষক সহকারী

আফরোজা নার্গিস
শিক্ষক সহকারী

ফৌজিয়া ফেরদৌস
শিক্ষক সহকারী

মোর্শেদা আক্তার
শিক্ষক সহকারী

অফিস সহায়কে নিয়োজিত যারা

মো. মোশাররফ হোসেন
ল্যাব এটেনডেন্ট

মো. সাইদুল ইসলাম
ল্যাব এটেনডেন্ট

মো. আব্দুল মালেক
ল্যাব এটেনডেন্ট

সৈয়দা তাসলিমা বেগম
ল্যাব এটেনডেন্ট

নুরুল ইসলাম নাহিদ
ল্যাব এটেনডেন্ট

মো. শহিদুল ইসলাম
অফিস এটেনডেন্ট

মফিজল হক
অফিস সহায়ক

মো. আব্দুল আওয়াল
অফিস সহায়ক

মো. নেহারুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

মো. ইব্রাহিম
অফিস সহায়ক

সুজল হক
অফিস সহায়ক

আজাহারুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

আরিফ রব্বানী
অফিস সহায়ক

মো. সুরুজ্জামান
অফিস সহায়ক

সাইফুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

ফরহাদ হোসেন
অফিস সহায়ক

অফিস সহায়কে নিয়োজিত যারা

মো. রকিবুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

মো. সাইফুল ইসলাম-২
অফিস সহায়ক

রাকিব হাওলাদার
অফিস সহায়ক

মোছা. মনোয়ারা খাতুন
অফিস সহায়ক

ফাতেমা খাতুন
অফিস সহায়ক

রুমা বেগম
অফিস সহায়ক

পুষ্প রানী
অফিস সহায়ক

সাবিনা ইয়াসমিন
অফিস সহায়ক

মোছা. মাহফুজা আক্তার
অফিস সহায়ক

মো. আলাউদ্দিন
মোটর পাম্প এটেনডেন্ট

নিলু রবি দাস
পরিচ্ছন্ন কর্মী

শংকর শাংমা
পরিচ্ছন্ন কর্মী

সাইদুল ইসলাম
পরিচ্ছন্ন কর্মী

চানিক রবি দাস
পরিচ্ছন্ন কর্মী

প্রদীপ নেকলা
পরিচ্ছন্ন কর্মী

মো. মুরাদ হোসেন
পরিচ্ছন্ন কর্মী

অফিস সহায়কে নিয়োজিত যারা

ফয়েজ
পরিচ্ছন্ন কর্মী

শিউলি বেগম
পরিচ্ছন্ন কর্মী

মো. তরিকুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আজিজুল হক
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আবদার হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. জসিম উদ্দিন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আনোয়ার হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আক্তার হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. মোর্শেদ আলম
নিরাপত্তা প্রহরী

মিন্টু মিয়া
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আসাদুল হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. আজাদুল ইসলাম
গ্রাউন্ডস্ম্যান

মো. উসমান গণি
গ্রাউন্ডস্ম্যান

তোতা মিয়া
রাজ মিস্ত্রি

সৈয়দ মাহাবুব আলম
বাস হেলপার/অফিস সহায়ক

মো. জহিরুল ইসলাম
বাস হেলপার/অফিস সহায়ক

কলেজ প্রতিবেদন

সৈয়দ কাদিরুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি

ময়মনসিংহ সেনানিবাসের দক্ষিণ পশ্চিমের বিস্তৃত প্রান্ত জুড়ে শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশে অবস্থিত ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী। ২৭ বছর ধরে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি রেখে যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। দেশের পূর্ব প্রান্তে সেনাবাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটি এ অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে রচনা করেছে আদর্শ পরিবেশ। বিগত বছরগুলোতে এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে রাষ্ট্রের ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ছাত্র-ছাত্রীরা দেশ গড়ায় রাখছে সক্রিয় ভূমিকা। শিক্ষার্থীদের গুণগত মান ও সার্বিক বিকাশে অনবদ্য ভূমিকার জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সকলের আস্থা অর্জন করেছে এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবস্থান তৈরি করেছে।

মূলমন্ত্র: শান্তি, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেম (Peace, Discipline and Patriotism).

পূর্বকথা: শিক্ষা-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ এই অঞ্চলে ১৯ পদাতিক ডিভিশনের সদর দপ্তর ছিল ময়মনসিংহ সেনানিবাসে। সেনানিবাসের অভ্যন্তরে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুলে সেনাসদস্যদের সন্তানদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। তৎকালীন ৭৭ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এজাজ আহমেদ চৌধুরী ব্রিগেডের অন্যান্য কর্মকর্তার সহযোগিতায় ১৯৯৩ সালের ৪ মার্চ প্রতিষ্ঠা করেন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল মোমেনশাহী। বর্তমান স্টেশন সেন্ট্রাল স্কুলের পাশে যে ট্রেনিং শেড রয়েছে, সেই ভবনের কয়েকটি কক্ষে নার্সারি থেকে ৬ষ্ট শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম চালু হয়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয় ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের প্রায় ৫.৬৬ একর জমিতে। প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন সভাপতি মহোদয়ের নেতৃত্বে ও শিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে যেতে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক প্রফেসর এম আলমগীর। ইতোমধ্যে স্কুল ও প্রশাসন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন সেনাবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, বীর বিক্রম, পিএসসি। স্কুল ভবন, প্রশাসন ভবন ও শিক্ষক কোয়ার্টার ভবন নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে চলতে থাকে এবং এর সার্বিক তদারকি করেন তৎকালীন ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রফিকুল আলম। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে কলেজ শাখার সংযোজন হয় ১৯৯৯ সালে। কলেজ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, বীর বিক্রম। তৎকালীন শিক্ষাসচিব কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদ কলেজ শাখার শুভ উদ্বোধন করেন। কলেজ শাখার পাশে চারতলা একটি হোস্টেল ভবনও নির্মাণ করা হয়। উক্ত ভবনটি উদ্বোধন করেন ১৯ পদাতিক ডিভিশনের তৎকালীন জিওসি ও প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল এম হারুন আর রশিদ, বিপি, আরইডিএস, পিএসসি। হোস্টেল ভবনটি ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে হওয়ায় নিরাপত্তার কারণে হোস্টেল হিসেবে চালু না করে একাডেমিক কাজে ব্যবহৃত হয়।

সময়ের আবর্তে প্রতিষ্ঠানটির একাডেমিক ফলাফল উৎকর্ষ লাভ করায় এবং দিন দিন প্রতিষ্ঠানের মান বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীর চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানের পরিধি বৃদ্ধির প্রয়োজন পরে। তৎকালীন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুল হালিম চৌধুরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং ভূতপূর্ব সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাহিদুর রহমান (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) মহোদয়ের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের সাথে লাগোয়া প্রায় ৫.৫৩ একর খাস জমি সরকারের কাছ থেকে লিজ নেয়া হলে প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস প্রায় ১১.১৯ একরে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় ২০০৭ সালে ইংলিশ ভার্সন স্কুল শাখায় এবং পর্যায়ক্রমে কলেজ শাখায়ও চালু হয়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে স্কুল ও কলেজ শাখায় ১১৭ জন শিক্ষক রয়েছেন এবং ৪৩২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। প্রতিষ্ঠানের এই অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অংশিদার ভূতপূর্ব প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ, সম্মানিত সভাপতি মহোদয়বৃন্দ ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহোদয়দেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তাঁদের নাম ও সময়কাল নিম্নে উল্লেখ করা হল:

Memory Lane-Respected Chief Patrons

Ser	BA No	Rank & Name	Duration	
			From	To
1.	BA-201	Maj Gen Muhammad Ainuddin, BP, psc	16 Oct 1992	21 May 1996
2.	BA-207	Maj Gen Muhammad Matiur Rahman, BP	25 May 1996	29 Jan 1997
3.	BA-679	Maj Gen Syed Ahmed, BP, awc, psc	04 Feb 1997	09 Jan 1998
4.	BA-713	Maj Gen Muhammed Masudur Rahman, BP, nwc, psc	17 Feb 1998	06 Jan 1999
5.	BA-569	Maj Gen M Harun-Ar-Rashid, BP, reds, psc	07 Jan 1999	06 Mar 2000
6.	BA-1136	Maj Gen ATM Zahirul Alam, psc	07 Mar 2000	15 Feb 2001
7.	BA-1083	Maj Gen NA Rafiqul Hossain, psc	16 Feb 2001	02 Dec 2001
8.	BA-940	Maj Gen ASM Nazrul Islam, ndu, psc	19 Jan 2002	23 Mar 2002
9.	BA-1137	Maj Gen Moeen U Ahmed, psc	24 Mar 2002	09 Jan 2003
10.	BA-1466	Maj Gen Iqbal Karim Bhuiyan, psc	04 Feb 2003	03 Aug 2004
11.	BA-1559	Maj Gen Mohammad Ishtiaq, ndc, psc	04 Aug 2004	07 May 2007
12.	BA-1895	Maj Gen AKM Muzahid Uddin, ndc, afwc, psc	26 May 2007	19 Mar 2009
13.	BA-1738	Maj Gen Abu Belal Muhammad Shafiul Huq, ndc, psc	19 Mar 2009	19 Nov 2009
14.	BA-1629	Maj Gen Mohammad Mahboob Haider Khan, ndc, psc	20 Nov 2009	04 Apr 2012
15.	BA-2496	Maj Gen SM Shafiuddin Ahmed, ndu, psc	07 May 2012	14 Aug 2013
16.	BA-2659	Maj Gen Md Shafiqur Rahman, SPP, afwc, psc	14 Aug 2013	17 Feb 2015
17.	BA-2593	Maj Gen Firoz Hasan, ndu, psc	22 Mar 2015	16 Apr 2016
18.	BA-2582	Maj Gen Sajjadul Haque, afwc, psc	05 May 2016	10 Aug 2018
19.	BA-3349	Maj Gen Mizanur Rahman Shameem, BP, OSP, ndc, psc	11 Aug 2018	06 Aug 2020
20.	BA-3422	Maj Gen Shakil Ahmed, SPP, nswc, afwc, psc	07 Aug 2020	

স্মৃতির জানালায়-সভাপতি মহোদয়গণ

ক্রঃ নং	বিএ নং	পদবি ও নাম	সময়কাল	
			হতে	পর্যন্ত
১।	বিএ-২৭২	ব্রিগেডিয়ার এজাজ আহমেদ চৌধুরী, পিএসসি	২৬/০২/১৯৯৩	০৪/০৮/১৯৯৩
২।	বিএ-৮৩৩	ব্রিগেডিয়ার মো. জিল্লুর রহমান, পিএসসি	২৪/০৯/১৯৯৩	২১/০৫/১৯৯৬
৩।	বিএ-১১৩৮	ব্রিগেডিয়ার খোন্দকার কামালুজ্জামান, এনডিসি, পিএসসি	২২/০৫/১৯৯৬	০৫/০১/১৯৯৯
৪।	বিএ-১৫৭০	কর্নেল মো. রফিকুল আলম, পিএসসি	২৫/০১/১৯৯৯	০৩/০৯/২০০০
৫।	বিএ-১৫৭০	ব্রিগেডিয়ার মো. রফিকুল আলম, পিএসসি	০৪/০৯/২০০০	১৮/০২/২০০১
৬।	বিএ-১৭০৩	কর্নেল মোজাফ্ফর আহমেদ, বিবি, পিএসসি	০৮/০৪/২০০১	০৭/০৭/২০০১
৭।	বিএ-১৭০৩	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোজাফ্ফর আহমেদ, বিবি, পিএসসি	০৮/০৭/২০০১	১১/০১/২০০৩
৮।	বিএ-১৯০৪	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু জাহিদ মো. ফজলুর রহমান, পিএসসি	২৫/০২/২০০৩	০২/০১/২০০৫

ক্রঃ নং	বিএ নং	পদবি ও নাম	সময়কাল	
			হতে	পর্যন্ত
৯।	বিএ-১৭৮৫	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহম্মদ জাহাংগীর হোসেন, এনডিসি, পিএসসি	০৩/০১/২০০৫	১৭/০৩/২০০৬
১০।	বিএ-১৭৪৪	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রশিদউজজামান খান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	১৮/০৩/২০০৬	০৫/০৮/২০০৬
১১।	বিএ-১৮৫২	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আনোয়ারুল আজিম, বিপি, পিএসসি	০৬/০৮/২০০৬	১৮/০৮/২০০৬
১২।	বিএ-২০৪২	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাহিদুর রহমান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি+	০১/০৯/২০০৬	৩১/১২/২০০৭
১৩।	বিএ-২৪৪৯	কর্নেল কাজী এমদাদুল হক, পিএসসি	০১/০১/২০০৮	১৪/০৮/২০০৮
১৪।	বিএ-১৯৬৭	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, বিবি, পিএসসি	১৫/০৮/২০০৮	১৮/০১/২০০৯
১৫।	বিএ-১৯৬৪	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর, পিএসসি	২৩/০৫/২০০৯	০৯/০৮/২০০৯
১৬।	বিএ-২২৭০	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাসুদ হোসেন, পিএসসি	১০/০৮/২০০৯	৩১/০১/২০১০
১৭।	বিএ-২৬৬৬	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	০১/০২/২০১০	১২/০৫/২০১০
১৮।	বিএ-২২৭০	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাসুদ হোসেন, পিএসসি	১০/০৮/২০১০	২০/০১/২০১১
১৯।	বিএ-২৬১৮	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. ফিরোজ রহিম, পিএসসি, জি	৩১/০১/২০১১	০২/০৪/২০১১
২০।	বিএ-২৮৮৭	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহ সগিরুল ইসলাম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	০৩/০৪/২০১১	২৭/০২/২০১২
২১।	বিএ-২৮৯২	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহমেদ, পিএসসি	১৭/০৩/২০১২	১৭/০১/২০১৩
২২।	বিএ-৩০২৫	কর্নেল মো. আবুল হাসেম, পিএসসি	১৮/০১/২০১৩	২০/০৪/২০১৩
২৩।	বিএ-৩০২৫	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আবুল হাসেম, পিএসসি	২১/০৪/২০১৩	০৭/০১/২০১৪
২৪।	বিএ-৩২৯৮	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুন্সী মিজানুর রহমান, পিএসসি	০৮/০১/২০১৪	২৪/০৩/২০১৪
২৫।	বিএ-৩৫৩৪	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী মোহাম্মদ কায়সার হোসেন, পিএসসি	২৫/০৩/২০১৪	০৭/০৯/২০১৫
২৬।	বিএ-৩৫৯৬	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. সাজ্জাদ হোসাইন, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	০৪/১০/২০১৫	২৩/০১/২০১৭
২৭।	বিএ-৩৮১৩	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মঈন খান, এনডিসি, পিএসসি, এলএসসি	২৪/০১/২০১৭	২৪/০৯/২০১৮
২৮।	বিএ-৪৪১০	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেরদৌস হাসান সেলিম, এসইউপি, পিএসসি	২৫/০৯/২০১৮	১৪/০১/২০১৯
২৯।	বিএ-৪৪৩১	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মোস্তাফিজুর রহমান, এইচডিএমসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি	২৮/০১/২০১৯	২৫/০৪/২০১৯
৩০।	বিএ-৪৪২৩	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ মাসীহুর রাহমান, এসপিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	০৯/০৬/২০১৯	২২/০১/২০২০
৩১।	বিএ-৪৬৩৩	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক, বিএসপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	০২/০২/২০২০	

সিপিএসসিএম পরিবারের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ

ক্রঃ নং	বিএ নং পদবি ও নাম	সময়কাল	
		হতে	পর্যন্ত
১।	প্রফেসর এম আলমগীর	২০ মার্চ ১৯৯৩	৩০ জুন ১৯৯৯
২।	আবদুল হান্নান	০১ জুলাই ১৯৯৯	৩১ ডিসেম্বর ২০০৩
৩।	লেঃ কর্নেল রাশেদ আহমেদ (অবঃ)	০১ জানুয়ারি ২০০৪	০৭ মে ২০০৫
৪।	মোহাম্মদ আবদুল হালিম চৌধুরী	০১ জানুয়ারি ২০০৬	৩১ মে ২০১১
৫।	বিএ-৫৩৫৮ মেজর মো. লুৎফর রহমান, পিএসসি, এইসি	২০ সেপ্টেম্বর ২০১১	০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩
৬।	বিএ-৫৩৫৮ লেঃ কর্নেল মো. লুৎফর রহমান, পিএসসি, এইসি	০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩	২৩ ডিসেম্বর ২০১৪
৭।	বিএ-৩৯৫২ লেঃ কর্নেল মো. শহিদুল হাসান, এসইউপি	২৪ ডিসেম্বর ২০১৪	১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭
৮।	বিএ-৫৪৮৩ লেঃ কর্নেল মো. তাজুল ইসলাম, জি+, আর্টিলারি	১৭ জানুয়ারি ২০১৮	০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮
৯।	বিএ-৪০৯১ লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, পিবিজিএম, পিএসসি, সিগন্যালস্	২০ অক্টোবর ২০১৮	২৩ জুলাই ২০২০
১০।	বিএ-৬৬৪২ লেঃ কর্নেল মো. নাজিব মাহমুদ সজিব, পিএসসি, জি, আর্টিলারি	২৩ জুলাই ২০২০	

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ বিদ্যায়তন পাঠ্যক্রম ও সহপাঠক্রমের বিবিধ শাখায় মান ও গুণের বিচারে অভিজাত অবস্থান বজায় রেখে চলেছে। শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে এ প্রতিষ্ঠানটি একাধিকবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে মেধাস্থান অর্জন করেছে। ময়মনসিংহ জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে বেশ কয়েকবার এবং ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজগুলোর মধ্যে রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানের ফলাফল নিম্নরূপ:

Name of the Exam	Year	Total Examinee	Total Pass	A+	A	A-	B	C	D	Percentage of Passing
PECE	2017	206	206	190	16	02	-	-	-	100%
	2018	278	278	254	22	02	-	-	-	100%
	2019	271	271	255	16	-	-	-	-	100%

Name of the Exam	Year	Total Examinee	Total Pass	A+	A	A-	B	C	D	Percentage of Passing
JSC	2017	172	172	159	13	-	-	-	-	100%
	2018	274	274	105	142	21	06	-	-	100%
	2019	279	279	81	157	33	08	-	-	100%

Name of the Exam	Year	Total Examinee	Total Pass	A+	A	A-	B	C	D	Percentage of Passing
SSC	2017	166	166	145	21	-	-	-	-	100%
	2018	157	157	148	09	-	-	-	-	100%
	2019	131	131	65	66	-	-	-	-	100%
	2020	183	183	141	38	03	01	-	-	100%

Name of the Exam	Year	Total Examinee	**Total Pass**	A+	A	A-	B	C	D	Percentage of Passing
HSC	2017	513	504	92	329	73	10	-	-	98.25%
	2018	507	494	19	263	156	52	04	-	97.44%
	2019	527	525	74	337	91	21	02	-	99.62%

কেবল একাডেমিক ফলাফলেই নয়, মেধা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একাধিকবার বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ডে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছে। ২৭ বছরের এই যাত্রায় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে যুগলবন্দি করে এ প্রতিষ্ঠান তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সময়োপযোগী মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে একনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। নিম্নে কিছু কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা হলো:

ক্রম	আয়োজক প্রতিষ্ঠান	প্রতিযোগিতার নাম	পর্যায়	স্থান
১।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ (ভাষা ও সাহিত্য)	জাতীয় পর্যায়	পুরস্কার প্রাপ্ত
২।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ (ভাষা ও সাহিত্য)	বিভাগীয় পর্যায়	চ্যাম্পিয়ন
৩।	আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ	বাংলা বিতর্ক	জাতীয় পর্যায়	চ্যাম্পিয়ন (কলেজ পর্যায়)
৪।	আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ	বাংলা বিতর্ক	ঘাটাইল এরিয়া	চ্যাম্পিয়ন (স্কুল ও কলেজ পর্যায়)
৫।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	বিজ্ঞান চিন্তা	বিভাগীয়	সি গ্রুপে ১ম
৬।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	উচ্চাঙ্গ সংগীত	বিভাগীয়	এ গ্রুপে ১ম
৭।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সৃষ্টিশীল সাধারণ নৃত্য	বিভাগীয়	বি গ্রুপে ১ম
৮।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	ভরত নাট্টম	বিভাগীয়	সি গ্রুপে ১ম
৯।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	কথক নৃত্য	বিভাগীয়	সি গ্রুপে ১ম
১০।	ইসলামি ফাউণ্ডেশন	ইসলামি জ্ঞান	বিভাগীয়	১ম স্থান

সাম্প্রতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় যুক্ত হয়েছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। প্রতিষ্ঠানটিকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিরাপদ স্থান হিসাবে গড়ে তুলতে উন্নয়নের ধারা সদা চলমান। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও অধ্যক্ষ মহোদয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হল-

১। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পরিবহনের সুবিধার্থে ২টি কোস্টার ক্রয়।

২। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের জন্য একটি নতুন গাড়ি ক্রয়।

৩। জরুরি বিজ্ঞপ্তি দ্রুত প্রচার এবং প্রেষণামূলক বাণী প্রচারের নিমিত্তে ১টি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন ।

৪। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়নে স্কুল ও কলেজ ভবনের ক্লাসরুম ও বারান্দাসমূহে ১১৫ টি CC Camera স্থাপন ।

৫। স্কুল ও কলেজ শাখায় ২৮টি নতুন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালুকরণ।

৬। স্কুল ও কলেজ শাখার কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ১৭টি কম্পিউটার ও ৮টি কম্পিউটার টেবিল ক্রয়।

৭। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক ২টি কমন রুম স্থাপন ও সুসজ্জিতকরণ।

৮। লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন এবং বইসমেত সমৃদ্ধকরণ।

৯। বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসনির্ভর বই, মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা ও প্রেষণামূলক বই, ইংরেজি গল্প এবং উপন্যাসের বই ক্রয়ের মাধ্যমে লাইব্রেরি সমৃদ্ধকরণ।

১০। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জরুরি চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠানে এমআই রুম স্থাপন।

১১। স্কুল, কলেজ ও প্রশাসন শাখার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাজিরা রেকর্ডের জন্য ৩টি বায়োমেট্রিক মেশিন ক্রয়।

১২। স্কুল ও কলেজ শাখায় ১৯টি শ্রেণিকক্ষে সাউন্ড-সিস্টেম স্থাপন ।

১৩। পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান ল্যাবের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়।

১৪। স্কুল ও কলেজ শাখার স্টাফরুম ও পরীক্ষানিয়ন্ত্রণ কক্ষ সজ্জিতকরণ।

১৫। অফিস কক্ষে ১টি হেভি ডিউটি ডিজিটাল ফটোকপি মেশিন ও ১টি প্রিন্টার ক্রয়।

১৬। শিক্ষকদের আবাসিক ভবন সংস্কার (টাইলসকরণ) এবং সকল আবাসিক ভবনে সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ।

১৭। সিএসডি সংলগ্ন খেলার মাঠ বালু ভরাটকরণ এবং মাঠের চারপাশে ড্রেন নির্মাণ।

১৮। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে সেনা সম্ভার হতে সিএসডি পর্যন্ত রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে ড্রেনের ওপর আরসিসি স্ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে ফুটপাত নির্মাণ।

১৯। প্রতিষ্ঠানের অডিটোরিয়ামের জন্য উন্নত সংস্করণের চেয়ার সংযুক্তকরণ

২০। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে রাস্তা বর্ধিতকরণ।

২১। প্রতিষ্ঠানের অডিটোরিয়ামের ছাদ মেরামতকরণ।

২২। প্রতিষ্ঠানের মসজিদ সংস্কার (২টি এসি ক্রয় ও স্থাপন, থাই দরজা স্থাপন ও বারান্দা নির্মাণ)।

সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটি অগ্রগতির এই গতিধারায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। দৃঢ় নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আপোষহীন এবং জ্ঞানের বাতিঘর হিসেবে প্রাচীন এ জনপদে আলো ছড়িয়ে চলেছে।

সিপিএসসিএম-এর পথনির্দেশিকা

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী, ময়মনসিংহ সেনানিবাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সড়ক ও রেল উভয় পথেই দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে ময়মনসিংহ শিক্ষানগরীর অন্যতম এ বিদ্যাপীঠে পৌঁছানো যায়। ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে যারা আসতে চান তারা শহরের মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ডে নেমে রিক্সা, অটোরিক্সা ও সিএনজি যোগে ৩০-৪০ মিনিটে, এছাড়াও কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, শেরপুর, জামালপুরসহ দেশের যেকোন জায়গা থেকে ব্রিজ সংলগ্ন শম্ভুগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড নেমে এবং রেলপথে যারা আসবেন ময়মনসিংহ রেলস্টেশন থেকে রিক্সা, অটোরিক্সা ও সিএনজি যোগে ২০-৩০ মিনিটে ময়মনসিংহ সেনানিবাসের ১নং এমপি চেকপোস্টে পৌঁছতে পারবেন। সানকি পাড়া শেষ মোড়ে অবস্থিত ১নং এমপি চেকপোস্ট অতিক্রম করে ২-৩ মিনিট হাঁটার পরেই চোখে পড়বে প্রতিষ্ঠানের প্রধান গেইট। মূল গেইট পার হলে হাতের বাম পাশে প্রশাসনিক ভবন। যার সামনে বাগানবিলাসের অপরূপ সৌন্দর্য, হাসনাহেনা ফুলের বিমোহিত সৌরভ, হরেক রকম বাহারি পাতাবাহার আর রাস্তার পাশে কাটা মেহেদি গাছের সুচারু-পরিপাটি রূপের পাশেই বিচিত্র বর্ণিল রূপে শুভেচ্ছা জানাতে প্রস্তুত প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিনন্দন ফুলের বাগান। হাতের ডানপাশে সবুজ ঘাসের কার্পেটে ঢাকা মাঠের উত্তরে ভাষা শহিদদের স্মরণে নির্মিত শহিদ মিনার। শহিদ মিনারের পূর্বপাশে গোলাপের বাগান আর রক্তলাল কৃষ্ণচূড়ার গাছের ফাঁকে উঁকি দেয় জ্যামিতিক নকশার চমৎকার সাজানো পরিপাটি ক্যান্টিন। এরপর চোখের সামনে পড়বে তিনটি বিশাল ভবন। ১ম ভবনটি ইংলিশ ভার্সন স্কুল শাখা, ২য় ভবনটি কলেজ শাখা, ৩য় ভবনটি বাংলা ভার্সন স্কুল শাখা। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য রয়েছে দৃষ্টিনন্দন অডিটোরিয়াম। প্রতিটি ভবনই দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন রঙে সাজানো। শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক সমাবেশ ও খেলাধুলার জন্য রয়েছে ২টি সুবিশাল মাঠ। ছায়া সুনিবিড়, সুশৃঙ্খল ও পরিপাটি পরিবেশে একবার আসলে বারবার আসতে মন চাইবে।

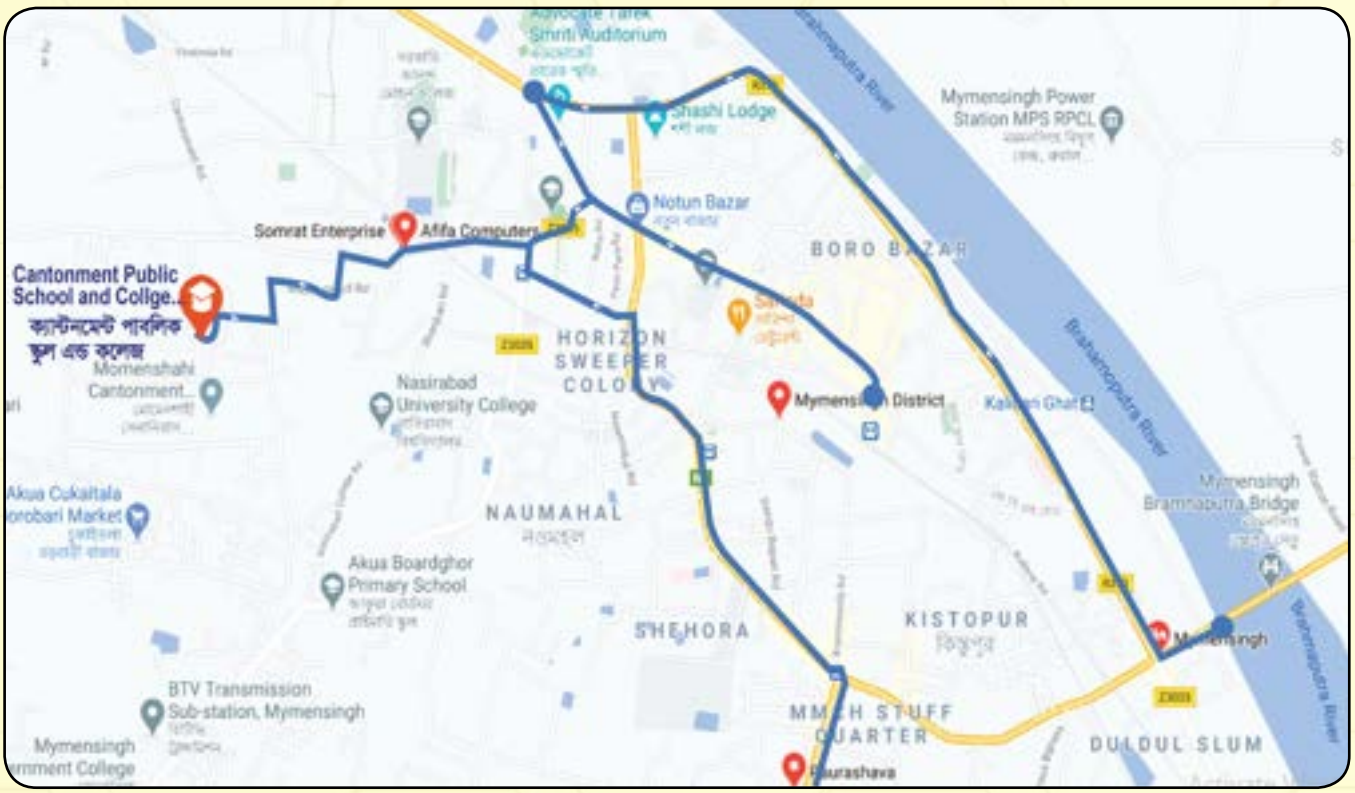

“আমাদেরকে সোনার দেশের সোনার মানুষ হতে হবে”
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা’

রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু

মো. আবু সাঈদ
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

বাঙালি, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা এ বাংলার রূপ-সৌন্দর্য-সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে ফরাসি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশদের আগমন ঘটে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এ উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে তারা দখল করে নেয় পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ। শুরু হয় আমাদের ওপর নির্যাতন-নিষ্পেষণ, শোষণ - বঞ্চনার ইতিহাস। ব্রিটিশ তথা ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন চলে দীর্ঘ প্রায় দুইশত বছর। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে গঠিত হয় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়ায় পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রে বাঙালিদের অবস্থা রয়ে যায় আগের মতই। শুধু ক্ষমতার পালাবদল হয়, আমাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমাদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নতুন করে ঔপনিবেশিক শাসন চাপিয়ে দেয়। কিন্তু বাঙালিরা মুখ বুঁজে তা মেনে নেয়নি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। যদিও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয় ব্রিটিশ শাসনামলে ছাত্রাবস্থায়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণতা আসে পাকিস্তানি শাসনামলে আওয়ামী লীগের রাজনীতির মধ্য দিয়ে। নেতৃত্বের এমন কোনো গুণ নেই যা বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে পাওয়া যায় না। মানবিকতা, মহানুভবতা, সততা, নিষ্ঠা, সাহসিকতা, দূরদর্শিতা, অপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতা, বিচক্ষণতা কী নেই তাঁর চরিত্রে! বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার জন্য তাঁকে কারাগারে কাটাতে হয়েছে প্রায় ১৪টি বছর। পরিবারের স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসার বন্ধনকে অগ্রাহ্য করে বাঙালির মুক্তির জন্য জীবনের সোনালি দিনগুলো কেটেছে কারাগারে নিঃসঙ্গ অবস্থায়। জাতির জনকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশে মাত্র সাড়ে তিন বছর রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর মধ্যে তিনি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবায়ন করেছিলেন অনেক অসাধ্য কর্মসূচি। বঙ্গবন্ধু একটি দেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনানির্ভর একটি সময়োপযোগী আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। একটি রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় এমন কোন বিষয় নেই যা তিনি স্পর্শহীন রেখেছিলেন। “রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু” বিষয়টি নতুন প্রজন্মের কাছে অনেকটাই অজানা। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে তিনি যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

নেতৃত্বের এমন কোনো গুণ নেই যা বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে পাওয়া যায় না। মানবিকতা, মহানুভবতা, সততা, নিষ্ঠা, সাহসিকতা, দূরদর্শিতা, অপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতা, বিচক্ষণতা কী নেই তাঁর চরিত্রে! বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বাধীনতার জন্য তাঁকে কারাগারে কাটাতে হয়েছে প্রায় ১৪টি বছর। পরিবারের স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসার বন্ধনকে অগ্রাহ্য করে বাঙালির মুক্তির জন্য জীবনের সোনালি দিনগুলো কেটেছে কারাগারে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

১। সংবিধান প্রণয়ন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রায় নয় মাস মুক্তি-সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করি। আন্তর্জাতিক চাপে জাতির জনক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাক সরকার মুক্তি দেয় ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি। প্রথমে যুক্তরাজ্য ও পরে ভারত হয়ে ১০ জানুয়ারি তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কালবিলম্ব না করে ১১ জানুয়ারি তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। স্থায়ী সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ২৩ মার্চ ১৯৭২ সালে তিনি গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। পরবর্তীতে এই গণপরিষদ ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করে এবং মাত্র এক বছরের মধ্যেই এই সংবিধান প্রণয়ন কমিটির মাধ্যমে আমাদের গণপরিষদ একটি গণমুখী সংবিধান রচনা করতে সক্ষম হয়। যা কার্যকর হয় ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে এত দ্রুত সংবিধান রচনা সত্যিই বিরল।

২। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এদেশের বীর বাঙালিরা অস্ত্রহাতে যুদ্ধে অংশ নেয়। যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর এই অস্ত্র যেন পরবর্তীতে কোনো নাশকতার কাজে ব্যবহৃত না হয়, এজন্যই জাতির জনক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসমর্পণের আহ্বান জানান। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালের মধ্যে জাতির জনকের নিকট তাদের নিজ নিজ অস্ত্র জমা দেন।

৩। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন

মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা জীবন বাজি রেখে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, যুদ্ধের পর তাঁদেরকে পুনর্বাসনের ব্যাপক কর্মসূচি জাতির জনক গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী, মিলিশিয়া বাহিনী, রিজার্ভ বাহিনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা প্রদান এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। দেশ গড়ার বিভিন্ন কাজে যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁদের নিয়োগ প্রদান করেন।

৪। ভারতীয় বাহিনীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র ভারত আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করেছিল। অনেকে ধারণা করেছিল ভারতীয় সৈন্যরা আমাদের দেশে দীর্ঘদিন অবস্থান করবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অপূর্ব কূটনৈতিক দক্ষতায় ১৯৭২ সালের ১২ মার্চের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী সকল ভারতীয় সৈনিক নিজ দেশে ফিরে যায়।

৫। পররাষ্ট্রনীতি

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়"। প্রথম তিন মাসের মধ্যে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ বিশ্বের ৬৩টি দেশের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হন বঙ্গবন্ধু সরকার। তিন মাস ২১ দিনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দুই বছর দুই মাসের মধ্যেই পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ।

৬। শিক্ষাসংস্কার

জাতির জনক শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী ও গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ১৯৭৪ সালে 'ডক্টর কুদরত ই খুদা শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন। স্বাধীনতার পর পরই ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। পাকিস্তান আমলে জারিকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুনসমূহ বাতিল করে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য নতুন আইন জারি করেন। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন এই আইনের সুফল ভোগ করছে।

৭। ইসলামি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

ইসলামের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী সঠিকভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার ও প্রসারের জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ ইসলামি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালে মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ এর নেতৃত্বে ছয় সহস্রাধিক বাংলাদেশি মুসলমানকে পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য তিনি সৌদি আরব প্রেরণ করেন।

৮। প্রথম সাধারণ নির্বাচন

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হয়েও ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম সাধারণ নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করেন। এ নির্বাচনে স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ আসনে বিজয়ী হয়।

৯। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা অর্থনৈতিক

মুক্তি অর্জনের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

১০। যমুনা সেতু

১৯৭৩ সালের ২৪ থেকে ২৮ অক্টোবর জাপান সফরকালে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকার সাথে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের সূচনা করেন। যদিও তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সেতুটি নির্মাণ করে যেতে পারেননি।

১১। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন

স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কার্যকর ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম 'বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করেন।

১২। বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ আদায়

বঙ্গবন্ধুর সুদক্ষ ও সুদূরপ্রসারী কূটনৈতিক দক্ষতায় বাংলাদেশ অল্প সময়ের মধ্যেই জাতিসংঘ, আইএমএফ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ আদায় করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশ ১৩৬তম রাষ্ট্র হিসেবে সদস্য পদ লাভ করে এবং ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন, যা ছিল জাতিসংঘের ইতিহাসে কোন রাষ্ট্রনায়কের প্রথম বাংলায় ভাষণ।

১৩। অবকাঠামোগত উন্নয়ন

মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী নিশ্চিত পরাজয় জেনে এদেশের রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্টসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস করে দিয়ে যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গবন্ধু সরকার দ্রুত এসব ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট ও স্থাপনা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১৪। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা

বাঙালি সংস্কৃতি লালনের জন্য, নতুন প্রজন্মকে বাংলা সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করার জন্য ১৯৭৪ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন।

এছাড়াও তিনি নিজস্ব মুদ্রা চালু করেন এবং টাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করেন। গ্রামবাংলার সাধারণ জনগণকে বিদ্যুতের সুবিধার আওতায় আনার জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। যাদের ১০০ বিঘার বেশি জমি আছে সেই অতিরিক্ত জমি এবং নতুন চর বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থাসহ ভূমি সংস্কারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মোটকথা একটি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের উন্নয়নে যা যা উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু তার সবই করেছেন। দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করেছেন এদেশের অবহেলিত দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে। তাঁর স্বপ্ন ছিল একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্রে সেনাবাহিনীর বিপথগামী একদল সৈনিকের হাতে নির্মমভাবে সপরিবার জাতির পিতা শহিদ হন। বাঙালির হৃদয় থেকে বঙ্গবন্ধুর নামটি চিরতরে মুছে ফেলার চক্রান্ত হয়। কিন্তু তাদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি থাকবে, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি থাকবে ততদিন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে চির জাগরূক হয়ে থাকবে জাতির জনকের নাম।

তাই অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতার চরণ দিয়ে লেখা শেষ করছি।

যতকাল রবে পদ্মা-যমুনা-গৌরী-মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।।

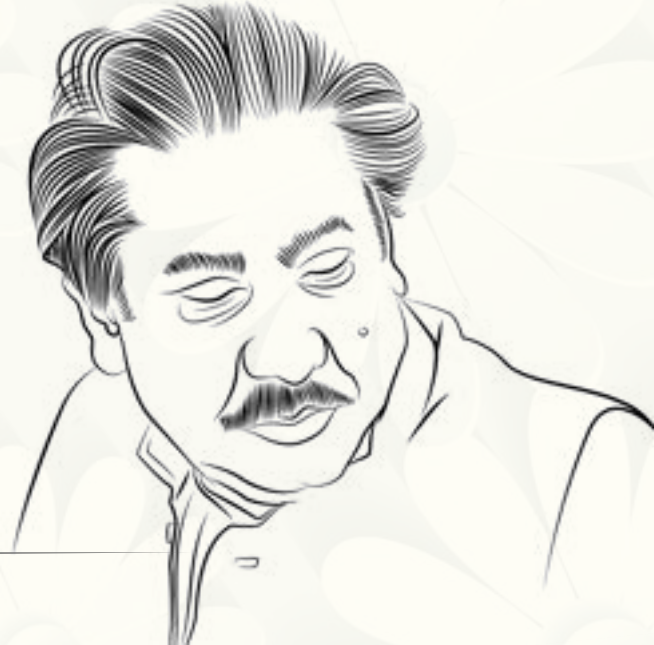

চেতনায় মুজিব

নাজিফা নিবাল লামিন
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-E, রোল-৪০১

মুজিব আমার কাছে শুধু একজন মানুষ নন, একটি চেতনা; তিনি মনুষ্যত্বের অনড় চূড়ার গণ্ডি পেরিয়ে হয়েছেন এমন এক চেতনা যা অম্লান ও অবিনশ্বর।

শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের কোল আলোকিত করে এসেছিলেন বাংলার আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি-সংগ্রামের মহানায়ক, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি, ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিশ্বনন্দিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যথার্থই বলেছিলেন :

"যতকাল রবে পদ্মা-যমুনা-গৌরী-মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুমালা রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয় হবে হবে জয়, জয় মুজিবুর রহমান।"

বঙ্গবন্ধু আমাদের অনুভূতি ও অন্তরাত্মায় মিশে আছেন। শেখ মুজিব মানেই বাংলাদেশ। জাতির পিতার প্রতি আমাদের ঋণ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অশেষ। শেখ মুজিব মানেই বাংলার মুক্ত আকাশ। শেখ মুজিব মানেই বাঙালির অবিরাম মুক্তির সংগ্রাম। শেখ মুজিব মানেই বাঙালি জাতির অস্তিত্ব। শেখ মুজিব মানেই বাঙালির ঠিকানা। শেখ মুজিব মানেই বাঙালি জাতির আশ্রয়-ভরসা। শেখ মুজিব মানেই বাঙালির আদর্শ। শেখ মুজিব মানেই ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝে মাথা উঁচু করে বাঙালির সঠিক পথে চলা। শেখ মুজিব মানেই বাঙালির মৃত্যুঞ্জয়ী চেতনা। শেখ মুজিব মানেই সাম্য-অধিকার-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। শেখ মুজিব মানেই দেশের জনগণের প্রতি, মানুষের প্রতি ভালোবাসা। শেখ মুজিব মানেই নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা। শেখ মুজিব মানেই বাঙালির আলোর দিশারী। শেখ মুজিব মানেই তো বাংলাদেশ, স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

সে কারণেই বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও জন্মদিনকে আমি বাংলার আকাশে স্বাধীন রক্তিম সূর্যের উদয় বলে মনে করি। বঙ্গবন্ধু কেবল একটি স্বাধীন দেশ দিয়ে যাননি, স্বাধীন বাংলায় গরিব-দুঃখীসহ তাঁর সাড়ে সাত কোটি সন্তান যাতে বিশ্বে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে সে ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার জন্ম না হলে বিশ্বের মানচিত্রে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেতাম না। বঙ্গবন্ধু স্কুলজীবনেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট চলাকালীন বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ৬ দফা উত্থাপন, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরি ও নেতৃত্বদানের মাধ্যমে এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন। এটাই সত্য যে, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো না। সে কারণেই বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও জন্মদিনকে আমি বাংলার আকাশে স্বাধীন রক্তিম সূর্যের উদয় বলে মনে করি। বঙ্গবন্ধু কেবল একটি স্বাধীন দেশ দিয়ে যাননি, স্বাধীন বাংলায় গরিব-দুঃখীসহ তাঁর সাড়ে সাত কোটি সন্তান যাতে বিশ্বে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে সে ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর এ মহতী কর্মগুলো অর্থাৎ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের কাজ সম্পাদন করেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিরাজগঞ্জে এক জনসভায় হাজার হাজার জনতার সামনে তিনি বলেছিলেন, "শাসনতন্ত্রে লিখে

দিয়েছি যে, কোনো দিন আর শোষকরা বাংলার মানুষকে শোষণ করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। আমি বাঙালি। বাঙালি জাতি হিসেবে বাঁচতে চাই সম্মানের সঙ্গে।"

মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ছিল সীমাহীন। তিনি বাংলাদেশের জনগণকে নিজ সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন। ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন 'আপনার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা কী?' জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি।' ডেভিড ফ্রস্ট আবার প্রশ্ন করেন, 'আপনার বড় দুর্বলতা কী?' এ প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি আমার দেশের মানুষকে বেশি ভালোবাসি।' এ কথার মাধ্যমে জনগণের প্রতি জাতির পিতার অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের প্রতি বিশ্বাসের বিষয়টিও সুস্পষ্ট। বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনটাই ছিল মানুষকে ভালোবাসার। দেশকে ভালোবাসতে হবে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে এটা ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের অন্যতম দর্শন। তিনি শুধু জনগণকে ভালোবাসতেন না, বাংলার জনগণকে নিয়ে তিনি গর্ববোধও করতেন। তাই মানুষের অধিকার ও দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে এবং দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে কখনো পিছু হটা তো দূরের কথা বিন্দুমাত্র ভয়ও পাননি। এমনকি মহান মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময়ে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় নির্জন সেলের সামনে কবর খুঁড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভয় পাইয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা। কিন্তু অসীম সাহসী বাঙালির নেতা শেখ মুজিব ভয় পাননি; বরং পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে বলেছেন, **"আমি বাঙালি, আমি মুসলমান, আমি মানুষ। মানুষ একবার মরে, বারবার মরে না। আমি কখনই আত্মসমর্পণ করব না। যদি তোমরা আমাকে মেরে ফেল, মৃত্যুর পর, আমার লাশটা আমার দেশে, আমার মানুষদের কাছে পৌঁছাইয়া দিও।"**

বঙ্গবন্ধু আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বাংলার খোকা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ ডিঙিয়ে কলকাতা ও ঢাকা ছাপিয়ে সমগ্র বিশ্বের বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের হৃদয়ে আসন করে নিয়েছেন। বিশ্বখ্যাত কিউবার সংগ্রামী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দেখে বলেছিলেন, "আমি হিমালয় দেখিনি, হিমালয় সমান মুজিবুর রহমানকে দেখলাম।" বিখ্যাত সংবাদপত্র নিউজ উইক বঙ্গবন্ধুকে উল্লেখ করেছিল 'পোয়েট অফ পলিটিক্স' নামে। জাতিসংঘের ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজের অংশ হিসেবে অর্থাৎ বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিশ্বের ইতিহাসে এমন ভাষণ আর দ্বিতীয়টি নেই। তিনি যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুর্নগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন ঠিক তখনই কতিপয় কুচক্রীর হাতে নির্মমভাবে স্বপরিবার শহিদ হন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। কিন্তু না, মুজিব মরেনি, মরতে পারে না। শতবর্ষে শেখ মুজিব শতকোটি গুণ শক্তিশালী। বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া বাংলাদেশের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। বঙ্গবন্ধুকে সব সময়ই স্মরণ করতে হবে। বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুকে সব সময়ই স্মরণ করবে। মুজিব শতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা, আদর্শ, নীতি, জীবন, শিক্ষা ও চিন্তা আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, "সোনার বাংলা গড়তে চাইলে সোনার মানুষের দরকার।" বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হৃদয়ে ও কর্মে ধারণ করে আমাদের সবাইকে সোনার মানুষ হতে হবে। এ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশ যদি একটি আধুনিক ও সভ্য রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে চায়, বিধ্বস্ত বিশ্বে মানবকল্যাণ ও শান্তির আলোকবর্তিকা জ্বালাতে চায়, তাহলে অনন্তকালজয়ী মহানুভব শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। তাইতো মুজিব আমাদের চেতনা।

তথ্য সূত্র:

১. কারাগারের রোজনামচা, শেখ মুজিবুর রহমান।

২. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান।

মুজিব বর্ষে আমরা

সুবাইতা সুলতানা সুবহা
শ্রেণি-২য়, শাখা-ক, রোল-০৯

বাংলাদেশের ইতিহাস
মুজিবুর রহমান,
এই বছরই মুজিব বর্ষ
রইবে যে বহমান।
বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা
গৌরবোজ্জ্বল নাম,
স্বাধীনতায় তাঁর অবদান
ইতিহাসে আমরা যে লিখলাম।
শতবর্ষে মুজিব বর্ষ
এলো যে দেশ জুড়ে,
গাইবো সবাই আনন্দ গান
স্বাধীনতার সুরে।

মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধু

রুবীনা আজাদ
প্রভাষক, বাংলা

টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নিল
এক যে বাঘের বাচ্চা
বড় হয়ে তিনিই হলেন
সাচ্চা নেতা সাচ্চা।
বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা
জাতির জনক জানি
নিজের জীবন বাজি রাখেন
মুছতে জাতির গ্লানি।
সাতই মার্চে বজ্রকণ্ঠে
দিলেন নেতা ভাষণ
মানবো না আর ভিনদেশিদের
ছলচাতুরি শাসন।
যার যা আছে তুলে ধরো
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো।
নেতার ডাকে বীরবাঙালি
বেরিয়ে এলো পথে,
নয়টি মাস যুদ্ধ করে
ফিরল বিজয়রথে।
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
মুক্তিদাতার নামে
বাংলাদেশটা স্বাধীন হলো
লক্ষ প্রাণের দামে।

জাতির পিতা

মুহ্‌তাসিমাহ্‌ তাইয়্যেবা
শ্রেণি-২য়, শাখা-ক, রোল-০২

দিনের শুরু থেকে দিনের শেষে,
তোমারই সুর-ধ্বনি আসে ভেসে।
তুমি মহান তুমিই সেরা,
ওগো মোদের জাতির পিতা।

তুমি দিয়েছো মোদের পথের দিশা,
তোমার কথা কভু যায় নাকো ভোলা।
পড়াশুনা করে আমরা
গড়বো তোমার স্বপ্নের সোনার বাংলা।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি

জাইমা বিনতে জামাল
শ্রেণি-৪র্থ, শাখা-ঙ রোল-৯১

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
যার জন্ম না হলে
আমরা পেতাম না
লাল-সবুজের পতাকা,
মুজিবের মুখের হাসি
স্বপ্ন রাশি রাশি।
যাঁর মুখে ছিল-মিষ্টি মধুর
সহজ-সরল বাণী।
৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে
রেখেছিল তারই প্রমাণ,
পঁচাত্তরে কুচক্রীর বুলেটের আঘাতে
হারিয়ে গেল জাতির প্রাণ।
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
লাল-সবুজের দিশারী।

তুমি ছিলে বলে হে বঙ্গবন্ধু

মো. ইরফান হোসনে (মীরাজ)
শ্রেণি-৮ম, শাখা-ক রোল-১০৮

তুমি ছিলে বলে হে বঙ্গবন্ধু,
পেলাম স্বাধীনতা।
তুমি দিলে ভাষণ বলে হে বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য
তোমার জন্য হয়েছে যে,
বাংলাদেশ ধন্য।
তুমি চলে গেলে হে বঙ্গবন্ধু,
কুচক্রীর ষড়যন্ত্রের হাতে,
তোমার জন্য সারা বাংলা
আজও যে কাঁদে।

বাংলার মুজিব

মুহতাদী আল মুঈদ তালুকদার (জাওয়াদ)
শ্রেণি-৪র্থ, শাখা- গ, রোল-২৯

টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নিল
সোনার ছেলে খোকা,
খোকা থেকে বড়ো হয়ে সে যে হলো
বাংলার অবিসংবাদিত নেতা।
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম"
"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"
একাত্তরে ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে,
বঙ্গবন্ধু মুখর হলেন স্বাধীনতার গানে।
বাংলাদেশের নামের পাশে
মুজিব অলংকার
তিনি হলেন বাঙালি জাতির
শ্রেষ্ঠ অহংকার।
পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট
নিকষ কালো রাতে,
শেখ মুজিব প্রাণ দিলেন সেই পশুদের হাতে।
হে জাতির পিতা,
শেখ মুজিবুর রহমান
চিরদিন তুমি বাঙালির প্রাণে
থাকবে বহমান।

বঙ্গবন্ধু

ফাহমিদা মুসতারী মালিহা
শ্রেণি-৩য়, শাখা-গ, রোল-৫৪

সূর্য ওঠে পূর্ব আকাশে
অস্ত যায় পশ্চিম আকাশে
আকাশে বাতাসে দেখেছি
বঙ্গবন্ধুর ছবিগুলো।
রাতের আকাশে মেঘের
মাঝে ভেসে বেড়ায়
বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিগুলো।
ঝিরিঝিরি বৃষ্টির
মধ্যে আছে
বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো।
আঁকাবাঁকা পথে রয়েছে
বঙ্গবন্ধুর পদচিহ্নগুলো।

বঙ্গবন্ধুর অবদান

সালভিয়া আলম সানিয়া
শ্রেণি-৫ম, শাখা-খ, রোল-৯১

বাংলা আশা বাংলা ভাষা
বাংলা আমার প্রাণ,
বাংলা ছাড়া থাকে নাকো
বেঁচে থাকার মান।
বাংলা আছে, বাংলা থাকবে
বাংলা চিরকালের,
বাংলার জন্য আমরা হলাম
ঋণী শেখ মুজিবের কাছে।
শুনে তোমার বজ্রভাষণ
বাঙালি দিয়েছে প্রাণ,
কেমন করে ভুলতে পারি
বঙ্গবন্ধু তোমার অবদান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে সিপিএসসিএম-এর শত প্রতিজ্ঞা

১। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করবো।
২। ভালো মানুষ হবো।
৩। সর্বদা সত্য কথা বলবো।
৪। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করবো।
৫। দেশপ্রেমে অটল থাকবো।
৬। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নকে সফল করবো।
৭। লেখাপড়ায় মনোযোগী হবো।
৮। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতো সাহসী হবো।
৯। সারা বছর ভালোকাজ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবো।
১০। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবো।
১১। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে সঠিকভাবে জানবো।
১২। সুন্দর ও সুশৃঙ্খল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হবো।
১৩। উদার মানসিকতার অধিকারী হবো।
১৪। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করবো না।
১৫। সর্বদা ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু থাকবো।
১৬। উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলবো।
১৭। বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করবো।
১৮। পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণ করবো না।
১৯। দুর্নীতিকে পরিহার করবো।
২০। মা-বাবার আদেশ যথাযথভাবে মেনে চলবো।
২১। পরিবারের প্রবীণদের দেখাশোনা করবো।
২২। প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করবো।
২৩। দেশীয় পণ্য ব্যবহার করবো।
২৪। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশে থাকবো।
২৫। নিজের দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানবো।
২৬। জাতীয় সম্পদের অপচয় করবো না।
২৭। সব সময় মার্জিত পোশাক পরবো।
২৮। কোন মানুষ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করবো না।
২৯। কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করবো না।
৩০। সর্বদা সদগুণাবলির অধিকারী হবো।
৩১। সর্বদা বিনয়ী ও উদার থাকবো।
৩২। যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলবো না।
৩৩। অসামাজিক কর্মকাণ্ড, নেশা ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকবো।
৩৪। পৃথিবীকে গড়ার জন্য নিজেকে গড়বো।
৩৫। শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা শিখবো।
৩৬। শুদ্ধস্বরে জাতীয় সংগীত গাইবো।
৩৭। ফেইসবুকে আসক্ত হবো না।
৩৮। বেশি বেশি বই পড়বো।
৩৯। ভালো ভালো কাজ করবো।
৪০। পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা করবো।
৪১। বৃক্ষনিধন করবো না।
৪২। গুজবে কান দেবো না।
৪৩। হিংসা ও অহংকার করবো না।
৪৪। ইভটিজিং করবো না।
৪৫। যৌতুককে না বলবো।
৪৬। বাল্যবিবাহ রোধ করবো।
৪৭। শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করবো।
৪৮। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবো।
৪৯। বিপদে অন্যকে সহায়তা করবো।
৫০। সহপাঠীদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবো।
৫১। পলিথিন ব্যবহার করবো না।
৫২। পাটের তৈরি ব্যাগ ব্যবহার করবো।

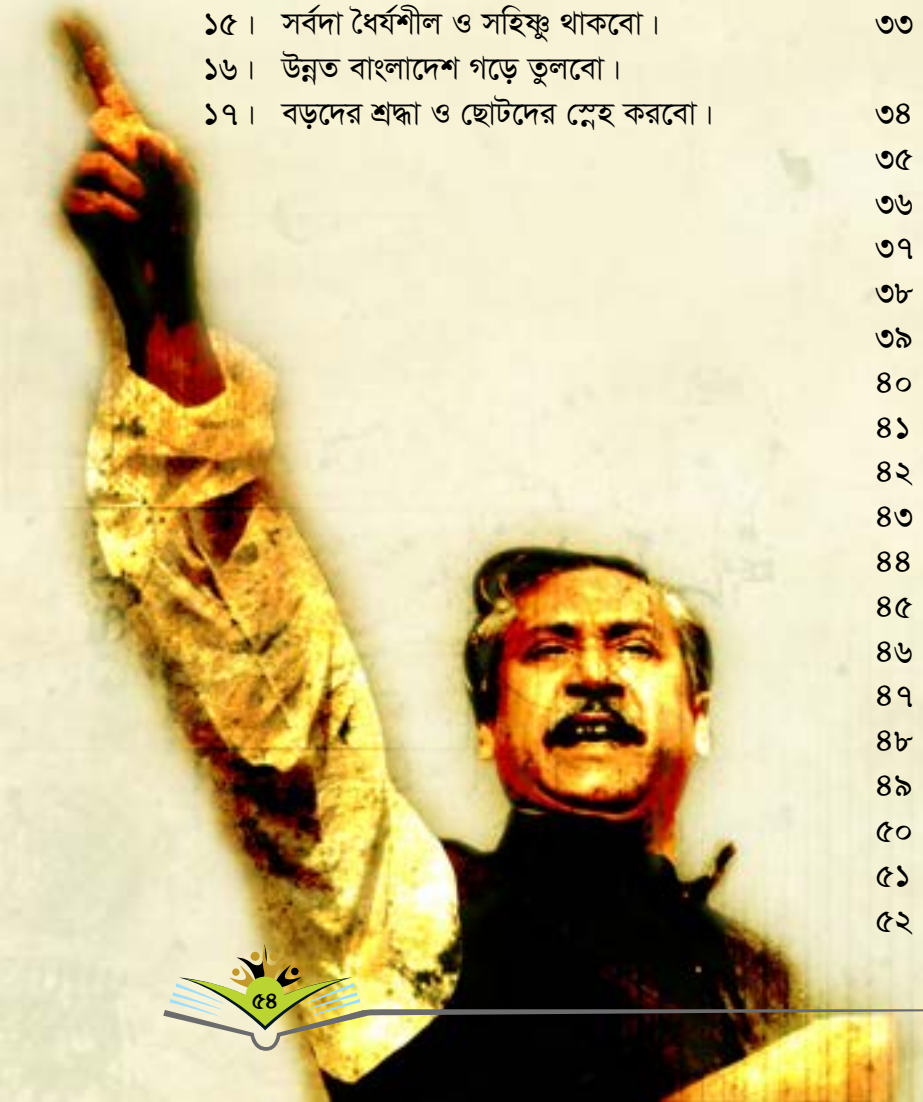

৫৩। ভোগবাদী মানসিকতা পরিহার করবো।
৫৪। ইতিবাচক ধারণা পোষণ ও নেতিবাচক ধারণা বর্জন করবো।
৫৫। সংকীর্ণতা বর্জন করবো।
৫৬। প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবো।
৫৭। সকল বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হবো।
৫৮। মানুষকে ভালোবাসবো।
৫৯। সকল জীবের প্রতি সদয় হবো।
৬০। সৎচিন্তা ও সৎকর্মে অনুপ্রাণিত হবো।
৬১। ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলবো।
৬২। জেব্রা ক্রসিং ও ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবহার করবো।
৬৩। আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবো।
৬৪। নিজের কাজ নিজে করবো।
৬৫। পরিবারের সবার প্রতি যত্নশীল হবো।
৬৬। মানবিক আচরণ করবো।
৬৭। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবো।
৬৮। বন্ধু নির্বাচনে সচেতন হবো।
৬৯। নিয়মিত শরীর চর্চা ও খেলাধুলা করবো।
৭০। সময়ানুবর্তী হবো।
৭১। যত্রতত্র ময়লা না ফেলে ডাস্টবিন ব্যবহার করবো।
৭২। বিপদে আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করবো।
৭৩। পরমতসহিষ্ণু হবো।
৭৪। অন্যের দুর্বলতা নিয়ে পরিহাস করবো না।
৭৫। অন্যের ব্যথায় সমব্যথী হবো।
৭৬। বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশগ্রহণ করবো।
৭৭। পানির অপচয় রোধ করবো।
৭৮। ভদ্র আচরণ করবো।
৭৯। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করবো।
৮০। অসৎ বন্ধুকে সৎপথে আনার চেষ্টা করবো।
৮১। সময়ের সঠিক ব্যবহার করবো।
৮২। মিতব্যয়ী হবো।
৮৩। ক্রোধকে দমন করতে শিখবো।
৮৪। বাসে উঠতে ডান পা, নামতে বাম পা ব্যবহার করবো।
৮৫। আদর্শ মানুষের জীবনী অনুসরণ করবো।
৮৬। যথাসময়ে ক্লাসে উপস্থিত হবো।
৮৭। যথাসময়ে সমাবেশে যোগদান করবো।
৮৮। পরিপাটি হয়ে ক্লাসে আসবো।
৮৯। সুশৃঙ্খল থাকবো এবং ক্লাসে অযথা হৈ চৈ করবো না।
৯০। সহপাঠ কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ করবো।
৯১। যথাসময়ে ইউনিফর্ম পরে প্রতিষ্ঠানে আসবো।
৯২। সবসময় পরিচয়পত্র বহন করবো।
৯৩। প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পদ অপব্যবহার ও নষ্ট করবো না।
৯৪। ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সহায়তা করবো।
৯৫। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করবো না।
৯৬। লাইব্রেরির বই ও পত্রিকার পাতায় অশালীন কথা লিখবো না।
৯৭। শ্রেণিকক্ষ, দেয়াল, বাথরুম প্রভৃতি নোংরা করবো না।
৯৮। ক্লাসে অনুপস্থিত থাকবো না।
৯৯। সিনিয়র শিক্ষার্থীদের সাথে বেয়াদবি ও জুনিয়রদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবো না।
১০০। কর্তৃপক্ষ জারিকৃত কোনো আদেশ অমান্য করবো না।

শিক্ষকবৃন্দের কলম থেকে

"কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে,
আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে
তাকেই বলে কালচার।
পাথরের ভার আছে,
আলোর আছে দীপ্তি।"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বানানের একাল-সেকাল

সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা

কালের পরিক্রমায় অন্য অনেক কিছুর মতো ভাষার ব্যবহারেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং গণমাধ্যমের প্রসার দূরকে নিয়ে এসেছে কাছে। জিএসপি, ই মেইল, এসএমএস, সিম, সেলফি প্রভৃতি শব্দ এখন আর বিদেশি নয়। শব্দগুলো এখন বাংলা ভাষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বাংলা বানান ও বর্ণ সুস্থিত সুশৃঙ্খল সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রথম প্রয়াস লক্ষ করা যায় আঠারো শতকের আটের দশকে এন. বি. হ্যালহেডের (১৭৭৮) ব্যাকরণে। উনিশ শতকের সূচনায় যখন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্ব শুরু হলো, বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের উন্মেষ হলো, তখন মোটামুটি সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন-অনুযায়ী বাংলা বানান নির্ধারিত হয়। কিন্তু এতে নানা ধরনের অসঙ্গতি দেখা দেয় এবং তা দূর করার লক্ষে প্রথমে বিশ শতকের বিশের দশকে বিশ্বভারতী এবং পরে ত্রিশের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান বেঁধে দেয়ার দায়িত্ব পালন করে, যা এ-যাবৎ আমরা অনুসরণ করে চলেছি। কিন্তু আধুনিক কালের দাবি অনুযায়ী, নানা বানানে যে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি দেখা যায় তা সংস্কার করা জরুরি হয়ে পড়ে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ এর পর সরকার, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও কোনো কোনো ব্যক্তি বাংলা বানান ও লিপি সংস্কারের চেষ্টা করেন। এরই পথ ধরে সরকার ১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক বাংলা বানানের নিয়ম প্রবর্তন করে। বাংলা একাডেমি ১৯৯২ সালের এপ্রিলে প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ১৯৯৪ সালে তা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। ২০০০ সালে এই নিয়মের কিছু সূত্র সংশোধিত হয়ে তা 'বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'-এর পরিমার্জিত সংস্করণের পরিশিষ্ট হিসেবে মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার পাঠ্যপুস্তকে ও সরকারি বিভিন্ন কাজে বাংলা একাডেমি প্রণীত বানানরীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনার পর ২০১৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা একাডেমির বাংলা থেকে বাংলা অভিধান ' বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান'। এই অভিধানে আমাদের পরিচিত বেশ কিছু শব্দের বানানে পরিবর্তন দেখা যায়, যা নিয়ে সুধীমহলে যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনা হয়। এরূপ কিছু শব্দের পরিবর্তিত রূপ ছন্দে-ছন্দে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

"হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে এবার গরু হলো 'গোরু'
একাডেমির নতুন নিয়ম করতে হবে শুরু।
ঈদ এখন 'ইদ' হয়েছে আছে একই রূপ
পটল হয়েছে 'পটোল' এখন পরিবর্তন কি খুব?
মর্জি বানান ঠিকই আছে দর্জি হয়েছে 'দরজি'
নতুনটাকে গ্রহণ করো, চলবে নাতো মর্জি।
নতুন বৌ বাড়িতে এলে বলবে না স্বাগতম
'স্বাগত' জানিয়ে 'বউ'কে বরণ করবেন প্রথম।
কৈ এখন 'কই' হয়েছে, ব্যাঙ হয়েছে 'ব্যাং'
ঈগল এখন 'ইগল' হলো হারিয়ে তার ঠ্যাং!
রেডিও কেউ না শুনলেও, আছে এখনো 'রেডিয়ো'
টিভিতে কেউ ভিডিও দেখেনা, মোবাইলে দেখে 'ভিডিয়ো'!
ঘুষ খাওয়া আর ঘাস খাওয়া অগৌরবের ব্যাপার
দুর্নীতিবাজদের নেই যেন বাধা, তবুও 'ঘুস' খাওয়ার!
রাণী এখন 'রানি' হয়েছে হারিয়ে তার গয়না,
অভিমানে তাইতো 'রানি' এখন কথা কয় না।
ঠেলতে ঠেলতে ঠেলাগাড়ি আরতো মোটে চলেনা,
'ঠ্যালা'র জন্য 'ঠ্যালাগাড়ি,' ঠেলাগাড়ি আর বলো না।
নামি-দামি প্রসাধনী মেখে অনেকেই হন ফর্সা,
ভরসা দিয়ে বলছেন তাঁরা এটা হবে 'ফরসা'।
ভণ্ড মজিদ মহব্বতনগরে এসে সেজেছে যে পীর,
'পির'এর কদর না থাকলেও এখন, মাজারে আছে ভিড়।
ছোট হয়েছে 'ছোটো' আরও, বড় হয়েছে 'বড়ো'
ঊষাকালে না ঘুমিয়ে, 'উষা'কালে 'হাঁটতে যেতে পারো।
ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ছেড়ে 'ব্যাবসা' করছে এখন
এখনকার 'ব্যাবহারিক' ছিল 'ব্যবহারিক' তখন।
সাথীরা আজ 'সাথি'র সাথে মিলে দিচ্ছে সঙ্গ
বিরক্তি নয়, বুঝতে হবে এটা নিয়মের অঙ্গ।"

বস্তুত ভাষার মতো বানানও পরিবর্তনশীল। বাংলা বানানের পরিবর্তিত রূপ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকতেই পারে। বাংলাভাষী হিসেবে আমাদের উচিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সবচেয়ে বড় গবেষণাপ্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত বাংলা বানানকে অনুসরণ করা।

তথ্যসূত্র: ১. বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।
২. ইন্টারনেট।

সৃজনশীলতা

এস এম জাহিদুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, জীববিজ্ঞান

মানুষ যা চিন্তা করে, তার দ্বারা নতুন কোনো কিছু তৈরি করা বা নতুনভাবে উপস্থাপন করার যে মানসিকতা, তাই সৃজনশীলতা। একটি শিশু যে ভঙ্গিমায় তার বাবা-মাকে ডাকে, এটাই তার সৃজনশীলতা। কেউ কেউ আবার বলে থাকেন যে, প্রশিক্ষণ, সফট স্কিল এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা জাতির উন্নয়ন সম্ভব সৃজনশীলতার দ্বারা।

প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনার দ্বারা নতুন কিছু তৈরি করা বা নতুনভাবে উপস্থাপন করাই সৃজনশীলতা। ছড়া-নাটক-উপন্যাস লেখা যেমন একধরনের সৃজনশীলতা, ঠিক তেমনি টিভি-মোবাইল আবিষ্কারও একধরনের সৃজনশীলতা।

সৃজনশীলতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন:

ক। **সংযোগকারী সৃজনশীলতা:** সমাজ তথা দেশের জন্য চিন্তা করে পরিবর্তন আনয়ন করা হচ্ছে সংযোগকারী সৃজনশীলতা। যেমন- বেগম রোকেয়া এধরনের কাজ করেছেন।

খ। **তত্ত্ববোধনী সৃজনশীলতা:** এ ধরনের সৃজনশীলতায় কারো একটি আবিষ্কার মানুষের আচরণ বা অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- স্টিভ জবস, বিল গেটস প্রমুখ ব্যক্তিদের সৃজনশীলতা।

গ। **বিশ্লেষণী সৃজনশীলতা:** এর ফলে সমাজে কতটুকু উন্নয়ন ঘটে তা মূল্যায়ন করা কঠিন। গান, কবিতা, গল্প, চিত্র, নকশা ইত্যাদি এ ধরনের সৃজনশীলতা। এতে সৃজনকারীর নিজস্ব সাধনা ও চিন্তা প্রতিফলিত হয়।

সৃজনশীলতা কীভাবে বাড়াবেন

সৃজনশীলতা দেহের অঙ্গের মতো, যাকে সুগঠিত রাখতে যেমন পুষ্টিকর খাবার খেতে হয়, নিয়মিত ব্যায়াম করতে হয়, তেমনি সৃজনশীলতা বাড়াতে হলেও চর্চার প্রয়োজন হয়। নিজস্ব সত্তা বা ভেতরের আমিকে জাগ্রত করা এবং তার পরিণত রূপ দিয়ে জীবন উপভোগই সৃজনশীলতা। কোন চর্চাগুলো মানুষের সৃজনশীলতা বাড়ায় তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। তবে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতে সৃজনশীলতা বাড়াতে আপনি নিম্নলিখিত ১০টি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে

পারেন। যেমন- নাচ করুন, গান করুন, লম্বা করে দম নিন, গান শুনুন, প্রকৃতির সঙ্গে সময় কাটান, ছবি আঁকুন, নিজের ভেতরের শিশুসত্তাকে জাগিয়ে তুলুন, আনন্দের উপলক্ষ তৈরি করুন, সহজাত প্রবৃত্তির ওপর আস্থা রাখুন এবং প্রাণ খুলে হাসুন।

সকল জীবই তার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা জীবন ও কর্মপ্রেরণাকে চালিত করে। সঙ্গে থাকে স্নায়ুর অনুবত বন্ধ (reffex ares) -প্রকৃতি প্রদত্ত সহজাত দেহ মনের সংগঠন ও তার দ্বারা চালিত হয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঁচার চেষ্টা। মানুষ এবং সকল প্রাণীই এর সঙ্গে চলমান।

মৌমাছি কি কারও কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছে? তা নয়, এটা তার সহজাত শিক্ষাবিহীন কৃৎকুশলতা কিন্তু পরিবর্তনহীন ও বৈচিত্র্যহীন। মানুষের মধ্যেও এ কৃৎকুশলতা আছে; যা তাকে তার সহজাত উচ্চমানের বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা প্রয়োগ করে শিখতে হয়, অর্জন করতে হয়। মানুষের বুদ্ধি বেশি বলে তার শেখার ক্ষমতাও বেশি। পাখি তার বাসাও কী সুন্দরভাবে তৈরি করে! মানুষের শিক্ষার্জিত যে বিচিত্রধর্মী নির্মাণ ও সৃষ্টি তা সম্ভব হয়েছে তার সৃজনশীল চিন্তা করার ক্ষমতা আছে বলে। সৃজনশীল চিন্তা হল কল্পনা ও যুক্তিধর্মী চিন্তার সমন্বয়। এটি একটি মানসিক ক্ষমতা, যার প্রকাশ জীবনের যে কোনো সময় হতে পারে।

মনোবিজ্ঞানিদের মতে, সৃজনশীলতা নির্ভর করে ফলদায়ী চিন্তা ও সমস্যা সমাধানকারী চিন্তা করার ক্ষমতার ওপর। একটি সমস্যাকে নানাভাবে দেখা ও বিচার করা এবং তাকে নতুন পটভূমিতে বিচার করে দেখা সমস্যা সমাধানের প্রথম ধাপ। এই সমস্যার প্রত্যক্ষ সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ ও আবহ তৈরি হয় এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সৃজনশীল ব্যক্তির মাঝে এই চিন্তা ও তার সমাধান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে।

মনোবিজ্ঞানী গিলফোর্ড ব্যক্তির মাঝে সৃজনশীলতাকে নিম্নলিখিত গুণাবলিতে চিহ্নিত করেছেন-

ক। শব্দ ভাণ্ডারের ব্যাপ্তি ও প্রতুলতা।

খ। ধারণা, চিন্তার ব্যাপ্তি ও প্রতুলতা।

গ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাষা বিন্যাস ও অর্থবোধের ব্যাপ্তির ক্ষিপ্রতা।

ঘ। অবয়ব ও চিত্র বিন্যাসে বৈচিত্র্য ব্যাপ্তির ক্ষিপ্রতা।

ঙ। একটি ধারণার সঙ্গে অন্য ধারণার অর্থকরী সংযোগের ক্ষিপ্রতা।

চ। ভাব প্রকাশে পারঙ্গমতা ও ক্ষিপ্রতা।

ছ। প্রতীকী ভাবনার সক্ষমতা ও ক্ষিপ্রতা।

জ। অনন্যতা ও স্বকীয়তা।

ঝ। বিস্তারিত ও অনুপুঙ্খ ভাবনার ক্ষমতা সৃজনশীল ব্যবস্থা হতে হবে প্রয়োগধর্মী বা জীবনমুখী; যা প্রাত্যহিক সার্বজনীন বাস্তবতার চাহিদা পূরণে কাজ করতে পারবে।

সৃজনশীল বিকাশের জন্য চাই ব্যাপক ও পরিকল্পিত প্রস্তুতি। আমরা বিশ্বাস করি, এ কর্মযজ্ঞকে সফল করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মেধাবী, যোগ্য ও কর্মকুশল বিশেষজ্ঞ আমাদের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ভূমিকা রাখার জন্য প্রস্তুত আছেন। আগামী দিনের দায়িত্বশীল ও সৃজনক্ষম নাগরিক তৈরির জন্য চাই ব্যাপক সৃজনশীল কর্মযজ্ঞ। জাতি হিসেবে এটি হল যুগপৎভাবে সময়ের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা। আশাবাদী মানুষ হিসেবে আশার পালে হাওয়া লাগবে, এটাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

তথ্য সূত্র:

১। ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং।

২। দৈনিক প্রথম আলো।

৩। দৈনিক সিলেটের ডাক।

করোনাকালীন একজন শিক্ষকের অভিজ্ঞতা

মো. আনিসুজ্জামান রানা
প্রভাষক, রসায়ন

১৬ মার্চ ২০২০, সোমবার। ছাত্র-ছাত্রীদের হৈ-হুল্লোড়, খেলাধুলা, সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ড আর রুটিন অনুযায়ী শ্রেণি কার্যক্রমে মুখরিত সিপিএসসিএম ক্যাম্পাস। দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত সকল একাডেমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আনুষ্ঠানিক বিদায়ের মাধ্যমে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে এইচএসসি-২০২০ এর চূড়ান্ত পরীক্ষায়। আবার একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও যথেষ্ট চিন্তামগ্ন তাদের পড়াশোনা নিয়ে, কেননা বর্ষউত্তরণী পরীক্ষার আর মাত্র ৬ দিন বাকি। অধ্যক্ষ মহোদয় ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দুপুর ১.৩০ মিনিটে মতবিনিময় সভা ডাকলেন অডিটোরিয়ামে। বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও ভাল ফলাফল অর্জনের নিমিত্তে দিক-নির্দেশনামূলক পরামর্শ শেষে যখনই ছুটির ঘণ্টা বেজে ওঠবে, ঠিক তখনই বাতাসে (ইন্টারনেটে) এক মহা বৈশ্বিক বিপদের গুঞ্জনে শঙ্কিত হয় পরিবেশ, স্তব্ধ করে দেয় সব উচ্ছ্বাস আর প্রাণচাঞ্চল্য।

সেদিন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি পরম উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছেন জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের। কিন্তু সকল আনন্দ নিমিষে বিলীন হয়ে যায় টেলিভিশন স্ক্রল ও সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রচারণায়। চলমান বিশ্বে সর্বাধিক উচ্চারিত হবে এমন একটি শব্দ যা সারা বিশ্বকে প্রকম্পিত করে বৈশ্বিক মহাবিপর্যয় ডেকে আনবে তা কেই বা জানত। একটি মাইক্রোস্কোপিক জীবাণু নোভেল করোনা ভাইরাস যেন স্তব্ধ করে দেয় পৃথিবীর হৃদস্পন্দন।

কিন্তু জীবনকে থমকে রাখা যায় না। একটি পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে নতুন আরেকটি পথের দ্বার উন্মোচিত হয়। একজন শিক্ষক হিসেবে আমাদের পরম কাঙ্ক্ষিত ও তৃপ্তির জায়গা হলো শ্রেণিকক্ষ। শ্রেণিকক্ষের ডায়াসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের মুখ পানে তাকালে পারস্পরিক সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলো মিলিত হয় আত্মার বন্ধনে। এই শিক্ষার্থীরাই আমাদের আরেকটি পরিবার, যেখানে সন্তানের ন্যায় আমরা ওদেরকে আগলে রাখি আবার কখনো স্নেহমাখা শাসনের বেড়াজালে আটকে রাখি। পথ হারালে নতুন পথের সন্ধান দেই।

কিন্তু স্থবির হয়ে যাওয়া শিক্ষা ও শিখন কার্যক্রমে আমরা বেশি চিন্তিত হই কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে। কারণ আমরা জানি এই বয়সে শিক্ষার্থীদের ব্যস্ত রাখতে হয় পড়াশোনা, খেলাধুলা ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সহপাঠক্রমিক

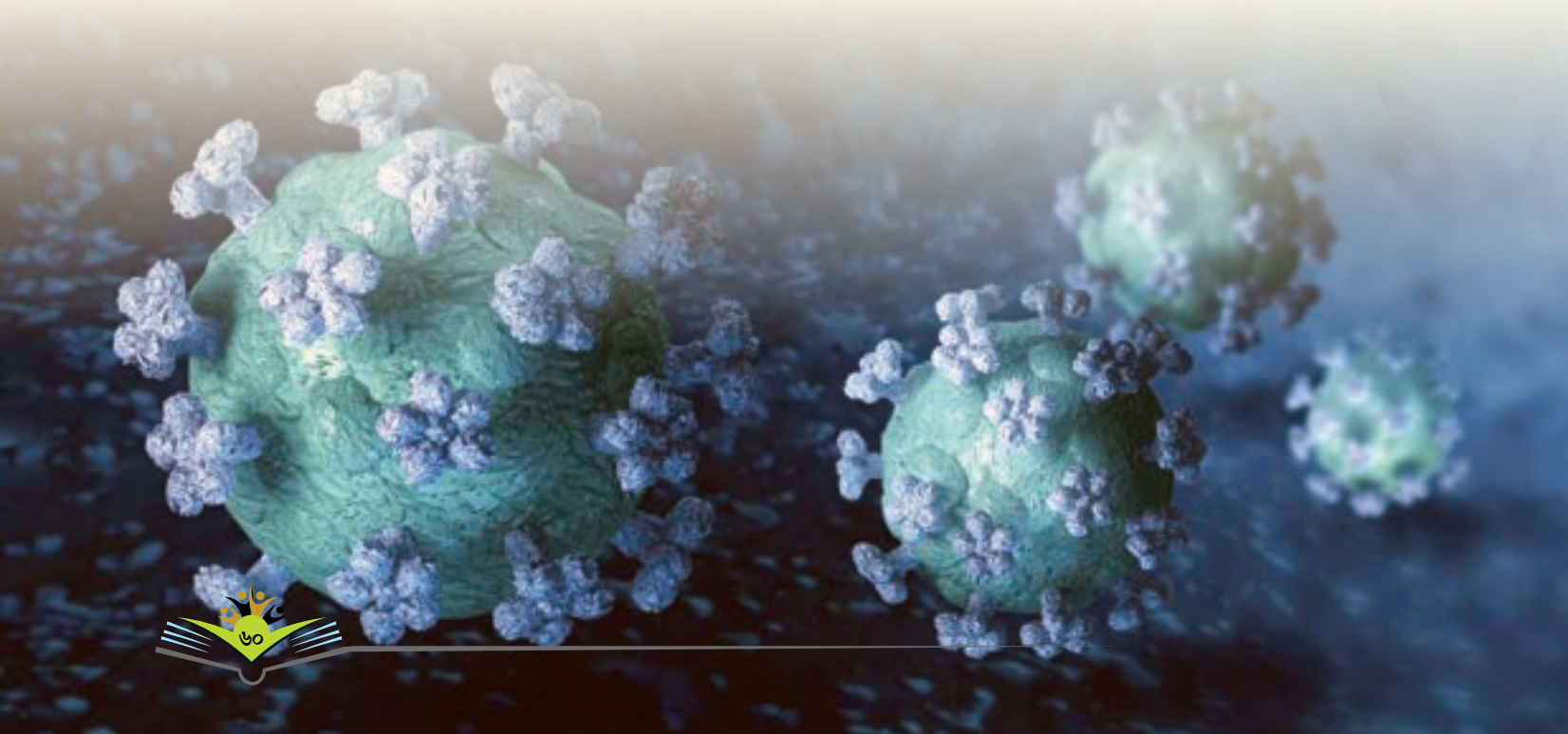

কার্যক্রমে। তা না হলে তাদের অলস মস্তিষ্ক ভিন্ন পথে পা বাড়াবে কিংবা বিভিন্ন অপরাধের মায়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে। অন্যদিকে তথ্য প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহে বদ্ধ ঘরে রুদ্ধ অবস্থায় যান্ত্রিক জীবনে ইন্টারনেট আর বিভিন্ন ডিভাইসগুলোই তাদের সঙ্গ দিবে এবং তাদের গতিপথ নির্ধারণ করবে।

তাই শিক্ষক হিসেবে করোনাকালীন আমরা শুরু করি অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম যেন ওরা সিপিএসসিএম পরিবারের সাথেই থাকে। পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কে ছেদ না পরে। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Facebook Live) এ এসে সরাসরি ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের ক্লাসের নিতে শুরু করি ৩১ মার্চ ২০২০ এ। এই পদ্ধতিটি আমাদের জন্য ছিল যথেষ্ট নতুন ও কষ্টসাধ্য। কেননা শিক্ষা উপকরণগুলো যেমন Whiteboard, Marker, Mobile Stand/ Device ইত্যাদি সংগ্রহ করা যতটা কঠিন ছিল, তার থেকে বেশি ঘর্মাক্ত হতে হয়েছিল সরাসরি শিক্ষার্থীবিহীন ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ক্লাস নেয়ায় কিন্তু শুরু করার পর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। সবকিছু যেন সবার নখদর্পণে। আমরাও ততদিনে যন্ত্রের ব্যবহার রপ্ত করে ফেলেছি, উপস্থিত শিক্ষার্থীবিহীন এই পদ্ধতিতে নিজেদের অভ্যস্ত করে ফেলেছি।

কিন্তু সত্যিকার ক্লাসের বা শ্রেণিকক্ষের স্বাদ উপভোগ করা যাচ্ছিল না। কিছুদিন পর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে Zoom Apps এর মাধ্যমে ক্লাস রুমের ন্যায় ছাত্র-শিক্ষক পারস্পরিক মেলবন্ধনের অপার সুযোগ তৈরি হয়। এই দূরদর্শী সিদ্ধান্তেই রুটিন মাফিক শ্রেণি কার্যক্রম অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে করোনাকালীন সবার কাছে শিক্ষাকে উপভোগ্য করে তুলেছে আমাদের সিপিএসসিএম।

কিন্তু আমরা জানি, আমাদের সীমাবদ্ধতা অনেক। আমাদের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির অধিকাংশ শিক্ষার্থী করোনাকালীন তাদের গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছে। অনেক জায়গায় দুর্বল নেটওয়ার্ক, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সংযোগ, কিংবা বাফারিংসহ ডেটা মোড আর দীর্ঘ সময় ক্লাস করার জন্য ভাল মানের মোবাইল ফোনের অভাব রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের সাথে যুক্ত থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে। অনেক ক্ষেত্রে অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরাও তাদের অভিভাবকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ডেটা কিনে সংযুক্ত হচ্ছে Zoom Live Class এ। যার প্রেক্ষিতে শিক্ষকবৃন্দ নিজেকে আরো বেশি উজাড় করে সর্বোচ্চটুকু দিয়ে করোনাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন।

করোনাকালীন হাজারো সমস্যা তৈরি হয়েছে এবং নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সর্বশ্রেণির মানুষ। কিন্তু এতকিছুর পরও একটি ইতিবাচক ফল হলো গ্রাম থেকে শহর যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক নিজেকে তৈরি করেছেন নতুনভাবে। যন্ত্রের ব্যবহার রপ্ত করেছেন, পাঠকে আকর্ষণীয় ও নির্ভুল করে তুলতে অনেকে নির্ঘুম রজনীযাপন করেছেন। এটি নিশ্চয়ই করোনার সময়ে আমাদের এক নতুন অভিজ্ঞতা। যা শিক্ষার্থীবান্ধব ও আনন্দময়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা

মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান
সহকারী গ্রন্থাগারিক

ল্যাটিন শব্দ লিবার (Liber) থেকে লিবরারিয়াম এবং লিবরারিয়াম থেকে ইংরেজি Library শব্দের উৎপত্তি। ইংরেজি Library কে বাংলায় গ্রন্থাগার নামে অভিহিত করা হয়। 'গ্রন্থ' মানে বই, 'আগার' মানে গৃহ অর্থাৎ বই রাখার গৃহকে গ্রন্থাগার বলা হয়।

গ্রন্থাগার সমাজ উন্নয়নের বাহন। একটি জাতির মেধা, মনন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও লালনপালনকারী হিসেবে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। তাই গ্রন্থাগারকে বলা হয় জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে- Education is the backbone of a nation। মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন কোন মানুষ চলতে পারে না, তদ্রুপ শিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট যে শিক্ষা তা হলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সফলতার সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হলো গ্রন্থাগার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ড বলে অভিহিত করা হয়।

> "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত।"

সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদি-অন্ত পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায়, মানুষ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে তার অনুভূতি, চিন্তা-ভাবনা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখতে। আর এই লিপিবদ্ধ করে রাখার উদ্দেশ্য হলো যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করা। সভ্যতার আদি থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে কালের প্রবহমান মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের বিচিত্র ও সমৃদ্ধির গতিপথে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মানুষের পাঠ-চাহিদা মেটানোর জন্য বিচিত্র উপাদান সংগ্রহ, সংগঠন ও সংরক্ষণের এ মহান কাজটি সম্পাদন করার তাগিদেই প্রয়োজন হয়েছে গ্রন্থাগারের।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন, "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত।" সারা বিশ্বের মনীষীদের চিন্তার সঙ্গে মহামিলনের পবিত্র স্থান গ্রন্থাগার। টুপার বলেছিলেন, "বই হলো আমাদের বর্তমান ও চিরদিনের পরম বন্ধু। আর এই বন্ধুর সঙ্গে সখ্য গড়তে হলে যেতে হবে লাইব্রেরিতে।" কারণ বইয়ের নির্ভরশীল আশ্রয়স্থল হচ্ছে লাইব্রেরি। জ্ঞানের তকমায় পূর্ণতা লাভে লাইব্রেরির গুরুত্ব অপরিসীম। সৈয়দ মুজতবা আলী 'বই কেনা' প্রবন্ধে বলেছেন, "বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।"

মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক জীব। বুদ্ধি ও মননের অনুশীলনের প্রয়োজনে মানুষ জ্ঞান আহরণ করে। এই জ্ঞান আহরণের উপায় দুটো। একটি ভ্রমণ, অন্যটি গ্রন্থপাঠ। ভ্রমণ ব্যয়সাপেক্ষ তাই সবার জন্য সম্ভব নয়। সে তুলনায় জ্ঞান আহরণের জন্য গ্রন্থপাঠ প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু জ্ঞানভাণ্ডারের বিচিত্র সমারোহ একজীবনে সংগ্রহ ও পাঠ করা সম্ভব হয় না। এই অসাধ্য কিছুটা হলেও সম্ভব হয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। গ্রন্থাগারের বিশাল সংগ্রহশালায় নিজের রুচি, মনন ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই কারণে জ্ঞানার্জনের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন।

মানুষের দেহের পুষ্টি জোগায় খাদ্য, আর বই জোগায় মনের খাদ্য। তাই বই সভ্য মানুষের নিত্যসঙ্গী। জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে গ্রন্থ। লেখক লেখেন, প্রকাশক ছাপেন, বিক্রেতা বই বিক্রি করেন আর গ্রন্থাগারিক তা সংগ্রহ করে যথাযথ বিন্যাস করেন এবং পাঠক সমাজ ঐ সব উপাদান থেকে মনের খোরাক এবং জ্ঞানলাভে সমর্থ হন।

গ্রন্থাগারে থাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থ। আগ্রহী পাঠকের জন্য গ্রন্থাগার জ্ঞানার্জনের যে সুযোগ করে দেয়, সে সুযোগ অন্য কোথাও নেই। গ্রন্থাগার গ্রন্থের বিশাল সংগ্রহশালা, যা মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করে জ্ঞানের মণিমুক্তা সংগ্রহের সুযোগ পায়। গ্রন্থাগারের আয়োজন সর্বসাধারণের জন্য অবারিত। চিন্তাশীল মানুষের কাছে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা অনেক বেশি।

গ্রন্থাগার জ্ঞান আহরণের সহজ মাধ্যম। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা উন্নত দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। অবসর সময়টা আড্ডা ও গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে না কাটিয়ে ছাত্র-শিক্ষক তাদের প্রতিদিনের এই অবসর সময়টা পড়ালেখায় কাটাতে পারেন। গণতন্ত্রের সাফল্যে গ্রন্থাগারের ভূমিকা গণমাধ্যমের চেয়ে কম নয়। আধুনিক বিশ্বে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা দিনে দিনে বাড়ছে।

প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, **"আমরা যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে। আমার মনে হয়, এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু অংশে কম নয় এবং স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশি।"** লাইব্রেরি হচ্ছে এক রকম মনের হাসপাতাল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আমাদের মৌলিক চাহিদাসমূহের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কাজেই আমাদের দেশে হাসপাতালের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারও স্থাপন করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

ড. মো. মিজানুর রহমান, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান।

প্রয়াত শিল্পী মুর্তজা বশীর স্মরণে

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান
সহকারী শিক্ষক

প্রখ্যাত ব্যক্তির সন্তান হয়ে বেড়ে ওঠার মাঝে বিড়ম্বনা কম নয়। খুব কম সংখ্যক মানুষই বিখ্যাত পিতার সুনাম, কর্ম ও ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে সমাজে নিজেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভারতীয় উপমহাদেশের একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, বহুভাষাবিদ, বিশিষ্ট শিক্ষক ও দার্শনিক। তাঁর সন্তান হিসেবে মুর্তজা বশীরকে নিজস্ব পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে সংগ্রাম ও পরিশ্রম কম করতে হয়নি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও চেয়েছেন তাঁর সন্তানরা সমাজে স্বনামে প্রতিষ্ঠিত হোক।

৯১ বছর বেঁচে থাকার ইচ্ছা ছিল মুর্তজা বশীরের। প্রিয় শিল্পী পাবলো পিকাসোর চেয়েও বেশি। কিন্তু ১৫ আগষ্ট ২০২০, শনিবার সকাল ৯টা ১০মিনিটে করোনা আক্রান্ত হয়ে ৮৮ বছরে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান এই গুণী চিত্রশিল্পী। চারুকলায় অধ্যয়নকালে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল স্যারের সান্নিধ্য পাওয়ার। স্যার এর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ও গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁরই আত্মজীবনী 'আমার জীবন ও অন্যান্য' গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি। আমার বিশ্বাস বর্তমান প্রজন্ম গুণী চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর সম্পর্কে জানতে পারবে-

মুর্তজা বশীর এর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার জীবন' থেকে কিছু অংশঃ

... আমি আমার মায়ের মুখে শুনেছি, আমার জন্মের দুদিন আগে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। ফলে দুরাত দুদিন আমার মা না পারতেন বসতে, না পারতেন শুতে, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ডা. বোস বলেছিলেন, প্রসূতিকে বাঁচাতে হলে সন্তানটিকে মেরে ফেলতে হবে। কিন্তু আমার মা তাতে রাজি হননি। তাই কোনো রকম দুষ্টুমি করলে মা আমাকে বলতেন- 'তুই জন্মের আগেও আমাকে জ্বালিয়েছিস, এখনো জ্বালাচ্ছিস।' শুনে মনে কষ্ট পেতাম। এর ফলে আমাকে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা ছেলেবেলা থেকেই ঘিরে ফেলে, যা থেকে আমি এখনো মুক্তি পাইনি ...।

বাবা বলে যাঁকে আমরা জানতাম, তিনি হলেন টুপি পরিহিত ছোট্ট দাড়িওয়ালা একটি লোক যিনি নিজের লাইব্রেরিতে বইপত্রের মধ্যে মগ্ন থাকতেন। তাঁর কাছে যাওয়ার সুযোগ তেমন ঘটত না। নামাজ পড়ার সময় তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তাম। এটুকুই। তবে মাসের প্রথম দিন তিনি তাঁর বেতনের টাকা টেবিলে রাখতেন এবং ছেলেদের বলতেন, যার যা ইচ্ছে নিতে। আমরা যখন ইচ্ছে মতন টাকা নিয়ে বেরোতাম তিনি সেই টাকাগুলো আমাদের হাত থেকে নিয়ে নিতেন। প্রত্যেকটি ছেলের নাম লেখা কাঠের বাক্স ছিল, সেখানে তিনি টাকাগুলো রাখতেন। সত্যি সাজানো গুছানো বাগানের মতো ছিল আমাদের পরিবার।

প্রতি রবিবার দুপুরের খাবার বাবার সঙ্গে আমরা ভাইয়েরা ডাইনিং টেবিলে খেতাম। সেদিন বাড়িতে একটা আনন্দ উৎসবের মতো ছিল। আমার মা সুন্দর ফুলের কলি বা ফুটন্ত ফুলের মতো সাদা টেবিল ন্যাপকিন দিয়ে গ্লাস সাজাতেন। প্লেটের একধারে থাকত ছুরি, কাটাচামচ, টেবিল চামচ এবং প্লেটের মাথার দিকে থাকত স্যুপ খাবার গোল চামচ। যেদিন আমাদের বাড়িতে ইংলিশ ফুড হতো সেদিন খানসামার গলাবন্ধ সাদা কোট মাথায় টারবান পরে মা আমাদের পরিবেশেন করতেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ছেলে বলে ছোটবেলা থেকেই আমার মধ্যে একধরনের আত্মগরিমা এবং সেই সঙ্গে কিছুটা ঔদ্ধত্য ছিল। একবার ক্লাস টেনে পড়ার সময় মুকুল ফৌজের মেয়েদের প্যারেডে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে সাইকেল চালিয়ে

লাইন ভেঙে দিয়েছিলাম। স্কুলের মাঠের পাশে একজন সাব-রেজিস্ট্রার বাস করতেন। তা দেখে তিনি বলেছিলেন, খোকা তুমি আজ যা করলে অন্য কেউ হলে তা ছিল ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু তোমার বাবা চিরদিন বেঁচে থাকবেন না। তখন কেউ তোমাকে রেহাই দেবে না। সেদিন তাঁর কথায় আমি যে স্বপ্নের জগতে বিচরণ করতাম তা থেকে পতিত হলাম।

আমার নানা ধরনের কীর্তিকলাপের কথা শুনে তিনি (বাবা) একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'শোনো, তোমার ইংরেজি গ্রামার বইতে তুমি পড়েছ না, এমিন্যান্ট ইনিম্যান্ট, প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপল, নটোরিয়াস ফেমাস। তুমি আমার সন্তান আইদার নটোরিয়াস অর ফেমাস, ডোন্ট বি এ মিডিওকার।'

বাবা চেয়েছিলেন আমি আলিগড়ে পড়াশোনা করি। তখনকার দিনে মুসলিম সমাজে এটা ছিল এক ধরনের বাসনা। কিন্তু যখন আর্ট কলেজে ভর্তির কথা বলি, তিনি বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, তিনি প্যারিসে ছিলেন, তিনি দেখেছেন আর্টিস্টদের জীবন অত্যন্ত কষ্টের এবং অনিশ্চয়তায় ভরপুর। তাঁর সন্তান অভুক্ত বা অনাহারে থাকবে, দুঃখকষ্টে দিনযাপন করবে, এটা পিতা হিসেবে তাঁর কাছে অশোভনীয়।

আমার সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে দেখে তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনে পড়ার জন্য। ... আমি ঢাকা আর্ট কলেজে পড়ার জন্য জেদ করলাম। প্রথম কয়েকদিন আমার সঙ্গে কথা বললেন না, তাঁর সঙ্গে নামাজ পড়তে ডাকলেন না। দুই-তিন দিন পর তিনি আমার হাতে ভর্তি হওয়ার জন্য টাকা দিয়ে তার সঙ্গে লাইব্রেরি ঘরে নিয়ে গেলেন। আলমারি খুলে ল্যুভর মিউজিয়ামের দুটো বই আমার হাতে তুলে দিলেন। বললেন, এই বই দুটি এতদিন ছিল আমার, আজ থেকে তোমার। চাইতাম লোকে বলুক মুর্তজা বশীরের বাবা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ছেলে মুর্তজা বশীর, এই পরিচয় আমারও কাম্য ছিলো না। আমি বরং চাইতাম লোকে বলুক মুর্তজা বশীরের বাবা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাই নামের শেষ থেকে উল্লাহ মুছে দিয়ে আমি মুক্তির স্বাদ অনুভব করেছি। এই পারিবারিক চিহ্নটি মুছে ফেলা বাবা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

আমার একটা চিঠি এসেছিল। বাবা তখন তাঁর লাইব্রেরিতে বইয়ের পাতায় নিমগ্ন। ডাক পিয়ন আমার একটা চিঠি দিলো। চিঠিটি বাবার সামনে রাখতেই তিনি চোখ বুলিয়ে

ফেরত দিলেন। ঘটনাচক্রে তখন আমি সেখানে। হাত বাড়িয়ে চিঠিটি নিয়ে দেখলাম আমার চিঠি। তিনি আমার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি অকম্পিত গলায় বললাম, উল্লাহ কেটে দিয়েছি। নিজের পরিচয়ে দাঁড়াতে চাই। তিনি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই দৃষ্টি এত স্বচ্ছ যে তাকানো যায় না সেদিকে। আপসেই মাথা নিচু হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে আমাকে মনে হয়েছিল বিদ্রোহী আওরঙ্গজেব। পিতা শাহজাহানের সম্মুখে নতজানু। ... তবু তিনি আমার নামের বানান সংশোধন করে দিয়েছেন। আমি ম-তে দীর্ঘ-উকার দিতাম মূর্তজা। তিনি বললেন, মূর্খের বানান দীর্ঘ-উকার হয়। তুমি তো মূর্খ নও। তুমি লিখবে ম-তে হ্রস্ব-উকার দিয়ে মুর্তজা। একবার আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। মাসের প্রথম দিন ছিল। সংসারের সব টাকা মার দেরাজ থেকে নিয়েছিলাম। আর বাবার সুটকেস থেকে আরও কিছু টাকা। লক্ষ্মৌ চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আবার ফিরে এসেছিলাম। বাসার জন্য মন খারাপ হয়েছিলো সাংঘাতিক। বাবা আরাম কেদারায় বসে বই দেখছিলেন। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। আমার ভীষণ ভয় করছিল। হয়তো তিনি মারবেন। কিন্তু তিনি মারলেন না। ধীর গলায় প্রশ্ন করলেন, কোথায় গিয়েছিলে? মাথা নিচু করে জবাব দিয়েছিলাম, লক্ষ্মৌ পর্যন্ত। আমার জবাবে তিনি ক্ষুণ্ন হলেন। বললেন, আগ্রায় গিয়ে তাজমহল তো দেখতে পারতে। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, আমার ছেলে তুমি। নটোরিয়াস বা ফেমাস হবে। মাঝামাঝি কিছু হও, আমি তা চাই না।"

তথ্যসূত্র: আমার জীবন ও অন্যান্য/মুর্তজা বশীর
বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড

সিপিএসসিএম এর স্কাউটিং

মো. নজরুল ইসলাম-২
জুনিয়র শিক্ষক

অরাজনৈতিক সমাজসেবামূলক যুব আন্দোলনের একটি নাম স্কাউটিং। এ আন্দোলনের প্রবর্তক রবার্ট স্টিফেন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল। তিনি স্কাউটদের জন্য নানা রকম আনন্দদায়ক কর্মসূচি প্রবর্তন করেছেন। এসব পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাজ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশে স্কাউটদের সর্বোচ্চ পদবি হলো প্রেসিডেন্ট এ্যাওয়ার্ড। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই পদক প্রদান করা হয়।

স্কাউট আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হলো ছেলেমেয়েদের শারীরিক, বুদ্ধিভিত্তিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানো। এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাকে সংক্ষেপে বিপি বলা হয়। বিপি ক্যাম্পিং করে নিশ্চিত হন যে, মুক্তাঙ্গনে বৈচিত্র্যময় কর্মসূচির মাধ্যমে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে অতি সহজে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে তাদের দৈহিক, মানসিক, আবেগিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ঘটিয়ে চরিত্রবান, দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

জেলা স্কাউট এর আহ্বানে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে এক দিনের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আমার স্কাউটে পথচলা। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে মুসিলম হাই স্কুলে ৫ দিনের বেসিক কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করি। এরপর থেকে প্রতিষ্ঠানের ৩২টি সোসাইটির মধ্যে বয়েজ স্কাউট সোসাইটিতে দায়িত্ব প্রাপ্ত হই এবং নিয়মিত শিক্ষার্থীদের এই স্কাউটিং প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছি। ২০১৫ সালের ৭ থেকে ১১ জানুয়ারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাই স্কুলে, সদর উপজেলার ৩০টি (বিদ্যালয়ের) দলের মধ্যে স্কাউট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশ ৮ জন শিক্ষার্থীসহ অংশ গ্রহণ করি। প্রতি বছর ৩২ থেকে ৪০ জন সদস্য নিয়ে দল গঠন করা হয় এবং এদেরকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জাতীয় দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন- একু ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৫ আগস্ট, ২১ নভেম্বর, ১৬ ডিসেম্বর ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সার্বিক শৃঙ্খলার দায়িত্ব স্কাউটরা যথাযথভাবে পালন করে আসছে। ২০১৮ সালে মুসলিম হাই স্কুলে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বিদ্যুৎ ক্যাম্পে নবম শ্রেণির দুই জন স্কাউট অংশগ্রহণ করে সাফল্যের সাথে কোর্স সম্পন্ন করে এবং সার্টিফিকেট অর্জন করে। ২০১৯ সালে '৬২ তম জোটা ও ২৩ তম জোটি' এর ইন্টারনেট প্রোগ্রামে অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পাঁচ জন স্কাউট রুমানা ইফফাত ম্যাডাম ও আমিসহ সাত জন জেলা প্রশাসকের আইসিটি ল্যাব, ময়মনসিংহে এক দিনব্যাপী ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারাবিশ্বব্যাপী এক যোগে স্কাউট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করি।

> এই চ্যালেঞ্জগুলোর ৪টির মধ্যে ২টি চ্যালেঞ্জে সিপিএসসিএম-এর শিক্ষার্থীরা পুরস্কার অর্জন করে। চ্যালেঞ্জ ২ আপন ঘর তাঁবুকলায় ৩ দিনে সেরা ৫ এর ৩টি পুরস্কার লাভ করে। যার মধ্যে অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বয়েজ স্কাউট দল প্রথম ও তৃতীয় দিনের ২টি পুরস্কার 'গৌরব পতাকা' লাভ করে এবং চ্যালেঞ্জ ৮ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় ছিল ১টি পুরস্কার। উক্ত পুরস্কারটিও অত্র প্রতিষ্ঠানের বয়েজ স্কাউট দল সেরা ৫ এর 'গৌরব পতাকা' লাভ করে।

৬ষ্ঠ উপজেলা স্কাউট সমাবেশ ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ, ২০২০ সার্কিট হাউজ মাঠ, ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী এর পক্ষ থেকে বয়েজ স্কাউট এর ৮ জন ও গার্লস ইন স্কাউটিং এর ৭ জন শিক্ষার্থীর দুইটি দলসহ রোকসানা পারভিন ম্যাডাম ও আমি অংশগ্রহণ করি। উক্ত সমাবেশে মোট ১২ টি চ্যালেঞ্জ ছিল। এই চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে যথাসময়ে সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট অর্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি করে। এই চ্যালেঞ্জগুলোর ৪টির মধ্যে ২টি চ্যালেঞ্জে সিপিএসসিএম-

এর শিক্ষার্থীরা পুরস্কার অর্জন করে। চ্যালেঞ্জ ২ আপন ঘর তাঁবুকলায় ৩ দিনে সেরা ৫ এর ৩টি পুরস্কার লাভ করে। যার মধ্যে অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বয়েজ স্কাউট দল প্রথম ও তৃতীয় দিনের ২টি পুরস্কার 'গৌরব পতাকা' লাভ করে এবং চ্যালেঞ্জ ৮ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় ছিল ১টি পুরস্কার। উক্ত পুরস্কারটিও অত্র প্রতিষ্ঠানের বয়েজ স্কাউট দল সেরা ৫ এর 'গৌরব পতাকা' লাভ করে।

এছাড়া ২০১৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ কর্তৃক আয়োজিত মহান বিজয় দিবসের 'কুজকাওয়াজ' অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ স্টেডিয়ামে প্রায় দেড় শতাধিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী এর বয়েজ স্কাউট, গার্লস ইন স্কাউটিং, রোবার স্কাউট, বিএনসিসি এর সমন্বয়ে একটি দল মার্চ পাস্টে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অর্জন করে এবং জেলা প্রশাসকের হাত থেকে ট্রফি গ্রহণ করে। এভাবে প্রতিষ্ঠানের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। স্কাউটরা বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম যেমন- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক আয়োজিত অগ্নিনির্বাপক ও ভূমিকম্প প্রতিরোধক মহড়ায় স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর রাখার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণসহ সবাইকে সচেতন করে থাকে।

বর্তমানে অধ্যক্ষ মহোদয়ের উৎসাহ উদ্দীপনায় স্কাউটরা বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

স্কাউটিং এর ফলে আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন- সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি, নেতৃত্ব দানে দক্ষতা, পড়াশোনায় ভাল করা ইত্যাদি। **বর্তমান ছেলেমেয়েদের স্কাউটে অংশগ্রহণ করা উচিত। কারণ স্কাউটিং এর মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা নিজের দেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশ সম্পর্কে জানতে ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে; হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সব পরিবেশে নিজেকে খাপ-খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। 'স্কাউটিং' ছেলেমেয়েদেরকে নেতিবাচক চিন্তা-চেতনা থেকে দূরে রাখে এবং নেশা ও মাদকদ্রব্য থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। তারা সমাজ ও দেশের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখে।** সর্বোপরি স্কাউটিং এর মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য এবং তার যত্নের প্রয়োজনীয়তা

এম এন তামান্না
কাউন্সেলিং এন্ড এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট

মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একজন মানুষ সেই ক্ষমতা অর্জন করে, যা তাকে নিজের সঙ্গে এবং তার চারপাশে থাকা অন্যদের সঙ্গে যুক্ত হতে বা একাত্ম হতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, এই দক্ষতার জোরে মানুষ জীবনের নানাবিধ চ্যালেঞ্জকেও গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

আমাদের বাস্তব জীবনে কোনো না কোনো সময়ে কোনো না কোনো বির্পযয়ের সম্মুখীন হতে হয়। এই বিপর্যয়ের চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে গিয়ে অনেক সময়ই মানসিক অবসাদ এবং উদ্বিগ্নতার শিকার হতে হয়। যখন আমরা দেখি আমাদের স্বাভাবিক কাজগুলি ব্যাহত হচ্ছে, তখনই মানসিক অসুস্থতার প্রশ্নটি সামনে আসে। শারীরিক সুস্থতার বিষয়ে আমাদের মনে একটা স্পষ্ট ধারণা ক্রমশই গড়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন যাপনের সঙ্গে যে অসুখগুলি জড়িয়ে রয়েছে, সে বিষয়ে আমরা যতটা সচেতন, মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে ততটা সচেতনতা দেখা যায় না। বেশিরভাগ সময়েই মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যাটি একটা ভুল ধারণার ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। গুরুত্বর্পূণ মানসিক সমস্যাগুলি নিরাময়ের জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, মানসিক সমস্যা দেখা দিলে তা বেশিরভাগ সময়েই চিকিৎসা করানো হয় না। বিষয়টি অবহেলা করা হয়। অধিকাংশ সমস্যাকেই ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক শারীরিক স্বাস্থ্যের মতোই। শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে আপনি যখন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, তখন আপনার অনেক কর্মশক্তি থাকে এবং আপনি ভালো কাজ করতে পারেন। আবার যখন আপনি মানসিকভাবে সুস্থ তখনও আপনি পূর্ণ উদ্যমে অনেক ভালো কাজ করতে পারেন।

মানসিক স্বাস্থ্য হলো আমাদের মন, আচরণগত ও আবেগপূর্ণ স্বাস্থ্যের দিকটি। আমরা কী চিন্তা করি, কী অনুভব করি এবং জীবনকে সামলাতে কীরকম ব্যবহার করি এগুলোই আসলে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য। একজন মানসিকভাবে সুস্থ মানুষ নিজের সর্ম্পকে ইতিবাচক ভাবনা পোষণ করে

এবং কখনোই কিছু আবেগ যেমন : রাগ, ভয়, হিংসা, অপরাধ বা উদ্বেগ দ্বারা আবিষ্ট হবে না। জীবনে যে রকম চাহিদা আসে, তা সামলে নেওয়ার ক্ষমতা তারা রাখে।

শারীরিক স্বাস্থ্যের মতোই যদি একজন বিভিন্ন নেতিবাচক আবেগ যেমন উদ্বেগ বা ভয় দ্বারা আবিষ্ট থাকে, তাহলে এই আবেগগুলো তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ করে দিতে পারে এবং সঠিক সময়ে সাহায্য না নিলে এগুলো কিন্তু পরবর্তীকালে মানসিক অসুস্থতা হয়ে দাঁড়াবে। যেমন- ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা বা জেনারেল অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার বা সাধারণ উদ্বেগ ব্যাধি।

মনে রাখবেন, ঠিক যেমন যে কারোর ঠাণ্ডা বা জ্বর হতে পারে তেমনি যে কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, যখন তাদের জীবনে কোন চাপ বা উদ্বেগের মতো কঠিন সময় আসে।

মানসিক সুস্থতা কাকে বলে ?

মানসিক সুস্থতায় মানুষ নিজের সম্ভাব্য শক্তির জায়গাগুলো সহজেই বুঝে যায়, জীবনের নানা পর্যায়ের চাপের সাথে ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারে, কর্মক্ষেত্রে ভালো ও ফলপ্রসূভাবে কাজ করতে পারে, সমাজের জন্য তার যথেষ্ট অবদান থাকে। তাহলে মানসিক সুস্থতার জন্য বা মানসিক প্রশান্তির জন্য বা কোনো নির্দিষ্ট আচরণ পরিবর্তনের জন্য অথবা কোনো প্রত্যাশিত আচরণ লাভের জন্য ইত্যাদি যে কোনো কারণে একজন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষের কাছে যেতে পারে পরার্মশ বা সহায়তার জন্য। অর্থাৎ একজন সাইকোলজিস্ট বা কাউন্সেলর এর শরণাপন্ন হতে পারেন। কিন্তু আমাদের সমাজে একজন সাইকোলজিস্ট বা কাউন্সেলর এর কাছে যাওয়া নিয়ে কিছু ভুল ধারণা কাজ করে। যেমন–

সাধারণত মনে করা হয় যে শুধু যারা পাগল তারা একজন সাইকোলজিস্ট বা কাউন্সেলর এর কাছে যায়, যা সর্ম্পূণ একটা ভুল ধারণা। আপনি যেমন ছোটো-বড়ো যে কোনো শারীরিক সমস্যার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন যা খুবই স্বাভাবিক, ঠিক তেমনি আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্য বা কোনো প্রত্যাশিত আচরণ লাভের জন্য একজন সাইকোলজিস্ট বা কাউন্সেলর এর শরণাপন্ন হতে পারেন। যেমন– আপনি হয়তো বেশ কিছুদিন ধরে কোনো একটা মানসিক চাপের মধ্যে আছেন এবং কী করবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না, তখন আপনি একজন কাউন্সেলর এর কাছে যেতে পারেন। তিনি আপনাকে সহায়তা করবেন আপনার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে।

আবার অনেক সময় দেখা যায় যখন কেউ সাইকোলজিস্ট বা কাউন্সেলর এর কাছে যায়, তখন অন্য কেউ বলে এটার প্রয়োজন নেই। আমার সাথেও এমন হয়েছে, কিছুদিন পর তা এমনিতেই ঠিক হয়ে গিয়েছে। আমরা একটা ব্যাপার হয়তো ভুলে যাই, প্রতিটা মানুষই আলাদা। তাদের খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাও আলাদা। একই পরিস্থিতিতে দুইজন ভিন্ন মানুষের দুই রকমের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। অর্থাৎ যে সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার পর অন্যজন খুব স্বাভাবিক থাকতে পারে, সেই একই সমস্যায় আপনি বিপর্যস্ত হতেই পারেন। আর তখন একজন কাউন্সেলর এর কাছে পরামর্শের জন্য যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

আবার দেখা যায়, অনেকের মধ্যে এমন চিন্তা কাজ করে যে লোকে কী ভাববে বা কী মনে করবে। অথচ দেখুন, আপনার শারীরিক সমস্যার জন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় কিন্তু আপনার মাঝে এমন চিন্তা আসে না। কারণ তখন আপনার কাছে আপনার শারীরিক সুস্থতাটা গুরুত্বপূর্ণ। আরও সহজভাবে বলতে গেলে একজন শিক্ষার্থী যে বিষয়ে দুর্বল সে কিন্তু সেই বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ শিক্ষক তার কাছেই যাবে সহায়তার জন্য। কিন্তু সে যদি তা না করে তাহলে তার সমস্যার কিন্তু সুষ্ঠু সমাধান হবে না।

সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকেই সুস্থতার প্রয়োজন হয়। যখন আপনি শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকেই সুস্থ থাকবেন তখন আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবনে আরও কর্মঠ এবং উদ্যমী হয়ে উঠবেন। তখন আপনার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তাতে পৌঁছানো আরও সহজ হয়ে যাবে। তাই আমাদের সকলের উচিত আমাদের শারীরিক এবং মানসিক উভয় সুস্থতাকেই গুরুত্ব দেওয়া।

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সিপিএসসিএম এর ভূমিকা

সাগরিকা সরকার অরুনা
মেডিকেল এসিসট্যান্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বর্তমান সময়ে উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রেই অগ্রগামী। সরকারের এই অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অগ্রগামী ভূমিকা রেখে চলেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী এর ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষার পাশাপাশি শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ দান করা। একজন স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে এই সরলমনা শিক্ষার্থীদের সাথে কাজ করাটা আমার কাছে আনন্দের ও গৌরবের।

প্রতিদিনের মতো নির্দিষ্ট নিয়মে আমি এম আই রুমে বসে কীভাবে এই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পাশাপাশি শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে সচেতন করা যায় তা ভাবছিলাম। কারণ এরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ। ঠিক এই সময়ে একজন শিক্ষার্থী রুমে আসার জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি চাচ্ছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে কান্নার ভাব দেখে চমকে উঠলাম। এখনই তো পরীক্ষা শুরু! তাকে এমন অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন?

বললাম, কী হয়েছে?

ম্যাডাম শরীরটা খুব অসুস্থ, হয়তো পরীক্ষা দিতে পারব না। বললাম, কিছু ভেবো না, ব্যবস্থা করছি। তারপর তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়ে পরীক্ষার হলে পৌঁছে দিলাম এবং কিছুক্ষণ পর আবার তার অবস্থা জানতে গেলাম, দেখি সে মনোযোগ দিয়ে লিখছে। বললাম, 'পরীক্ষা শেষ করে দেখা করে যাবে'।

যথাসময়ে সেই শিক্ষার্থী আমার রুমে এসে বলল, 'ম্যাডাম আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, আপনি না থাকলে হয়তো আজ আর পরীক্ষা দেওয়া হতো না'।

তারপর তাকে কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ ও পরামর্শ দিয়ে বাসায় পাঠালাম। সাতদিন পরে সে হাসিমুখে এসে বলল, ম্যাডাম 'আমি ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি'। নিজেকে তৃপ্ত মনে করলাম। সাথে সাথে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিলাম হৃদয় থেকে, যে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই কোমলপ্রাণ শিক্ষার্থীর শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য।

প্রতিদিন ক্লাস শুরুর আগে নিয়মিত প্রাতঃকালীন সমাবেশে বিভিন্ন শারীরিক অনুশীলন এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় মনোযোগ আর্কষণের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয় যা শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি ফ্লোরে রয়েছে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা ওয়াশরুম। আছে ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিন। আছে স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

সর্বোপরি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী এর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ এমন যুগোপযোগী উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য যা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে শিক্ষার্থীদের মনে।

মোবাইল ফোন চাই না

ফাতেমা খাতুন
সহকারী শিক্ষক, বাংলা

বেশ কদিন থেকে অরিত্রের মন-মর্জি বেশ খারাপ। বড় আপুর ওপর এমন রাগ হচ্ছে তার, আবার কিছু বলাও যাচ্ছে না। অরিত্রের বড় আপু এবার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছে। ভর্তি কার্যক্রম শেষ করে গতকালই বাসায় ফিরেছে। সেই থেকে আপুর আদর যত্ন যেন আগের চেয়ে আরও বেড়ে গেছে। ঐ দেখো মা কত আহ্লাদ করে আপুকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছে! রাগ-হিংসা না কি অভিমান বুঝতে পারলো না অরিত্র। তার খুব কান্না পেলো। চোখের পানি লুকাতে সে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুতে ওয়াশরুমে ঢুকে পরলো।

এই অরিত্র, তোমার বড় আপু নাকি মেডিকেলে চান্স পেয়েছে? অনেকের এমন প্রশ্নের উত্তরে অরিত্র একগাল হাসি দিয়ে উত্তর দিত হ্যাঁ। শুধু যে হাসি মুখ করে উত্তর দিত তাই না, মনে মনে একটু গর্বও অনুভব করত সে। কিন্তু যেদিন সপ্তম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো, তারপর থেকে অরিত্রের জীবনটা যেন অতিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্লাসটিচার থেকে শুরু করে বিষয় শিক্ষকরাও তাকে তিরস্কার-উপদেশ, সমবেদনা-উৎসাহ কোন কিছুই দিতে আর বাকি রাখল না। আর রাখবেই বা কেন? সপ্তম শ্রেণিতে তার রোল ছিল চার এবার অষ্টম শ্রেণিতে হয়েছে এগারো। বড় আপুর মেডিকেলে চান্স পাওয়ার কল্যাণে সবাই আরও বোনাস টাইপের উপদেশ দিতে শুরু করলো। ক্লাসটিচার বিউটি ম্যাডাম তো একদিন ক্লাসে বলেই ফেললেন-তোর বড় আপু এই স্কুল-কলেজ থেকে কত্ত ভালো রেজাল্ট করে এখন ডাক্তারিতে চান্স পেলো। আর তুই সারাদিন খালি চিংড়ি মাছের মতো লাফালাফি আর বাঁদরের মতো ঝাঁপাঝাঁপি করিস। কথাটা যদিও একেবারে মিথ্যা না। কিন্তু সবাই বিশেষ করে মেয়েরা দাঁত বের করে খিলখিলিয়ে একচোট হেসে নিল। তখন মেয়েদের হাসির বহর দেখে অরিত্রের চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করলো-এই শোন, আমার মোটেও বড় আপুর মতো আঁতেল টাইপের ভালো স্টুডেন্ট হবার ইচ্ছে নেই। যে মানুষ (আপু) দিন-রাত শুধু পড়ে আর পড়ে, টেবিলে রেখে দেওয়া যার খাবার বিড়াল এসে খেয়ে চলে গেলেও সে টের পায় না, এমন পড়াশুনা আমার দ্বারা সম্ভব না। কিন্তু মুখে অরিত্র কিছুই বলতে পারল না। নীরবে সব হজম করে নিল। অবশ্য অরিত্র বড়োদের কাছে শুনেছে এইচএসসি পাস করার পর ভালো কোথাও চান্স পেতে হলে অনেক অনেক পড়াশোনা করতে হয়। তবে কী সেটা বড় আপুর মতো পড়াশোনা? তবে তো জীবন তেজপাতা।

এর মধ্যে একদিন স্কুল শেষ করে বাসায় ফিরে অরিত্র দেখলো বড় আপুর হাতে খুব সুন্দর একটা মোবাইল সেট। মুচকি হেসে হাত উঁচিয়ে আপু মোবাইলটা দেখিয়ে বললো-তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নে, সবাই মিলে সেলফি তুলবো, অনেক মজা হবে। তুই চাইলে রাতে আধা ঘণ্টার জন্য তোকে গেমও খেলতে দিতে পারি। এমন সময় বাবা অফিস থেকে চলে আসলেন। মা ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন সবার জন্য খাবার রেডি করতে। আড়চোখে অরিত্র দেখলো বাবা কত আদর ভরা কণ্ঠে বড় আপুর সাথে কথা বলছেন।

খাবার খেয়ে বিছানায় কতক্ষণ গড়াগড়ি দিল অরিত্র। কিন্তু মনটা পড়ে রইল আপুর মোবাইল ফোনের কাছে। অরিত্রের সহপাঠী পিতুল, শান, হিছান, আদনান ওদের সবার মোবাইল ফোন আছে। ওরা কত মজা করে গেম খেলে, গান শোনে, নাটক-মুভি দেখে আরও কত কী! এবার রেজাল্টটা খারাপ হয়ে সব এলোমেলো হয়ে গেলো। না হলে সেও মার কাছে বায়না ধরত তাকেও একটা মোবাইল কিনে দিতে হবে। অবশ্য বাবাকে একথা বলার সাহস নেই তার। বাবা যা রাশভারী মানুষ! মনের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো অরিত্র। গণিত প্রাইভেট পড়ার জন্য একটু পর রেডি হতে হবে।

সন্ধ্যার পর মা নাস্তা বানিয়ে আনলেন। বড় আপু, মা, অরিত্র মজা করে নাস্তা করল। সবাই মিলে নতুন ফোন দিয়ে সেলফি তুললো। অরিত্রের বাবা যে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ সেও হাসিমুখে কতগুলো সেলফি তুলে ফেললো। **অরিত্র অবাক হয়ে দেখলো বাবাকে হাসলে অনেক সুন্দর লাগে! অবশ্য বাবা যে অরিত্রকে খুব বেশি বকাবকি বা রাগারাগি করেন তাও না। তবুও বাবাকে কেমন যেন ভয় লাগে অরিত্রের। ছোট বেলায় বাবাকে এমন ভয় ডর লাগত না। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে বাবাকে কেন যেন ভয় ভয় লাগে। কেন এমনটা হচ্ছে বুঝতে পারে না অরিত্র। সব কাজেরই যদি কারণ থাকে তবে এই ভয় পাওয়ার কারণটা কী? অরিত্র বুঝতে পারে না।**

পড়ার টেবিলে কিছুতেই মন বসছে না অরিত্রের। বড় আপু বলেছে ৯টার সময় তাকে মোবাইল দেবে গেম খেলার জন্য। এখন ঘড়িতে মাত্র সাতটা বেজে চল্লিশ মিনিট। অরিত্র প্রথমে অঙ্ক করার চেষ্টা করলো। তিন নম্বর অঙ্কের ফল মেলাতে না পেরে বিজিএস বই নিয়ে বসল। ওরে বাপরে! এত তথ্য আর সন-তারিখ পড়তে গিয়েও কোন কিছুই মাথায় ঢুকছে না। অথচ ঘড়িতে মাত্র আটটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট। এবার অরিত্র পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠেই পড়ল। ড্রইং রুমে আপুর পাশে গিয়ে বসে পড়ল অরিত্র। আপু বলল, এখনো ১০ মিনিট বাকি। আচ্ছা তোর জন্য ৪০ মিনিট সময় বরাদ্দ দিলাম গেম খেলার জন্য।

তন্ময় হয়ে গেম খেলছিল অরিত্র। যখন বড় আপুর ডাকে হুশ হলো তখন সে আবদারের সুরে বলল, আর একটু খেলিনা আপু, আর একটু প্লিজ। এমন সময় বাবা অরিত্রের পাশে এসে বসলেন। বড় আপু ঘড়ির দিকে ইঙ্গিত করলো। রাত প্রায় ১১টা বাজে। একী! বাবার হাতে অরিত্রের রেজাল্ট কার্ড! অরিত্রের প্রাণ-পাখিটা যেন ধড়াস করে ওঠল। বাবা অরিত্রকে তার পাশে বসালেন। কার্ডের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় গণিতে ৯৪ আর বার্ষিকে ৮২, ইংরেজিতে অর্ধবার্ষিকে ৮৭ আর বার্ষিকে ৭৩। অরিত্র মাথা নিচু করে বসে রইল। এরপর মা অরিত্রের পাশে এসে বসলেন। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, মোবাইলে গেম খেলে, ফেইসবুকে কিংবা যে কোন সোশ্যাল নেটওয়ারকিংএ প্রচুর সময় নষ্ট হয়। তুমি যে গত বছর তোমার বন্ধু নাফিজ এর ফোন ব্যবহার করে প্রায়ই গেম খেলতে এবং এজন্য প্রাইভেট পড়া শেষ হলেও ঘণ্টা খানেক দেরি করে বাড়িতে ফিরতে, এ কারণেই এবার তোমার রেজাল্ট বিপর্যয়।

অরিত্রের বুকটা ধক করে উঠল, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। মাথাটা নিচু হয়ে যেন বুকের সাথে গিয়ে ঠেকল। মনে মনে ভাবতে লাগল, মা এতসব জানলো কেমন করে? ঘটনাতো একদম সত্য! মা অরিত্রকে আরও বললেন, অষ্টম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা নভেম্বর মাসেই হয়ে থাকে। তুমি একটু চেষ্টা করলেই হয়তে A+ অথবা গোল্ডেন A+ পেয়ে যাবে, কিন্তু স্কলারশিপ পেতে হলে তোমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এবার তুমিই বলো অন্য সবার মতো তোমারও কি স্মার্ট ফোন চাই?

অরিত্র মুখ তুলে বাবা-মার দিকে তাকাতেই পারলো না। শুধু দুপাশে না সূচক মাথা নাড়ালো। আর মনে মনে বললো- রেজাল্ট কার্ড দেখে বাবা যে তাকে রাম ধোলাই দেননি এটাই ঢের বেশি। তার মোবাইল ফোন চাই না।

বোধ

সাবিহা রহমান
সহকারী শিক্ষক, বাংলা

আমি ড্রইং রুমে বসে বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম। রাত প্রায় আটটা বেজে চলল। এখনো আব্বু আসেনি। এমন না যে, আমি প্রতিদিন আব্বুর ঘরে ফেরার অপেক্ষায় থাকি। আসলে কোনোদিনই অপেক্ষা করিনি। আব্বু কখন যাচ্ছে, কখন আসছে তার দিকে খেয়াল করার সময়ই বা কোথায়? সারাদিন কলেজ, প্রাইভেট, বন্ধুদের সাথে আড্ডা নাহয় মোবাইলে গেমস খেলায় বুদ হয়ে থাকায় আমার নজর খুব কমই পড়তো আব্বুর দিকে। কোনো কোনো দিন অফিস থেকে ফিরেই ঘর্মাক্ত গায়ে আমার পাশে সোফায় গা এলিয়ে বসলে খুব বিরক্ত হতাম। কপাল কুঁচকে উঠে যেতাম আব্বুর পাশ থেকে। অথচ, আব্বু খুব করে চাইতো আমি তার কাছে যাই, সারাদিন কী করলাম সে গল্প শুনাই। আমার ভালো লাগে না আব্বুকে। এখন আব্বুর আদরও অসহ্য লাগে।

> বাবারা বুকের মধ্যে এক সমুদ্র ভালোবাসা পুষে রাখেন। আব্বুর বুকে মাথা রেখে সে ভালোবাসার সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে আমি কেঁদে দিয়ে বললাম, আমার ভুল হয়েছে আব্বু। আমার কিছু চাই না। শুধু তোমাকে চাই আব্বু। তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি।

ওহ হো, আমার নামই তো বলা হয়নি। আমি ঈশান। বেশ নামকরা কলেজে পড়ি। কখনো ফলাফল খারাপ করিনি। ভালো ছাত্র হিসেবে ছোটবেলা থেকেই আমার বেশ সুনাম। উত্তরার ১১ নং সেক্টরে একটা পুরনো ধাচের মোজাইক করা বাসায় আমরা থাকি। অবশ্য খুব গোছানো স্বভাবের আম্মু বাসাটাকে সুন্দর রাখার কোনো প্রচেষ্টাই বাদ দেন না। স্কুলে পড়ানোর পর পুরোটা সময় আমার আর বাসার পিছনে ব্যয় করতেন বলেই এসএসসিতে এতো ভালো ফলাফল করতে পেরেছি। আব্বু ব্যাংকে চাকরি করেন। আমার আব্বুটা খুব বেশি সাদামাটা। এই সাদামাটা জীবনেই আব্বু-আম্মু অনেক খুশি। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি আব্বু আমাকে আগলে রাখতেন, ঝুম বৃষ্টিতে ভিজতেন, নিয়ম করে শুক্রবার বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। গ্রামে গেলে পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি করে সাঁতার শেখাতে চাইতেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কবিতা আবৃত্তি শিখিয়ে দিতেন। আর ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করতেন। ১১ নং সেক্টরের এই বাসাটাতে আমরা প্রায় আট বছর ধরে আছি। আমাদের সে রঙিন সময়গুলো এখন আর নেই। আমি বড়ো হয়ে গেছি। আমার আলাদা জগৎ হয়েছে। আমাদের বাসায় এখন ইলেকট্রিসিটি চলে গেলেও আঁধার ঘনিয়ে আসে না। পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটবে বলে আব্বু বাসায় আইপিএস লাগিয়েছেন। এইতো গত মাসেই আমার প্রেজেন্টেশন আর এসাইনমেন্টের জন্য আব্বু প্রিন্টার কিনে আনলেন। আমার এসব ভালো লাগে না। আমি তো প্রিন্টার চাইনি। হাসিব আংকেল যিনি আব্বুর সাথেই চাকরি করেন, তাঁর ছেলে সুমনের মতো পালসার বাইক চাই আমার, রুদ্রর মতো আইফোন, পলাশের মতো ডিএসএলআর। এসব চাইতেই যত আপত্তি। আমার নাকি বয়স হয়নি। এসব কিনলে আমি নষ্ট হয়ে যাবো। এগুলো নাকি বিলাসিতা। আব্বু কখনো আমার দিকটা বুঝতে চান না। আর এসব কি বিলাসিতা? এগুলো না থাকলে বন্ধুদের সামনে কতো ছোটো হতে হয় তাকি আব্বু বোঝে? শুধু আদর্শের বুলি আওড়ানো। অসহ্য লাগে।

গত সপ্তাহে হাসিব আংকেলের বাসায় আমাদের দাওয়াত ছিল। নতুন বাসায় উঠেছেন। তাদের নতুন ফ্ল্যাটের চকচকে ঝলমলে আলোয় আমার নিজেকে খুব ম্রিয়মাণ লাগছিল। নিজের বাসার কথা মনে হতেই সূক্ষ্ম অথচ তীক্ষ্ম হিংসার হুল আমার মনে ফুটছিল। কী হয় ব্যাংকলোন নিয়ে একটা ফ্ল্যাট কিনলে? একটা গাড়ি কিনলে? নিজের অপ্রাপ্তি আর সুমনের সৌভাগ্য দেখে হিংসায় পুড়তে থাকা আমার দুর্ভাগ্যের কথা মনে হতেই নিজের প্রতি করুণা হয় আমার।

বাড়ি ফিরে আব্বুকে কঠিন গলায় বলেছিলাম এভাবে অন্যের নতুন বাড়িতে যেতে আমার ভালো লাগে না। একটা বন্ধুকেও বাসায় আনতে পারি না। ভাড়া বাসায় থেকে অন্যের আনন্দে

আনন্দিত হতে পারি না আমি। তোমার মতো মানুষের সন্তান হওয়াই আমার দুর্ভাগ্য। কথাগুলো বলে ঝড়ের বেগে নিজের রুমে চলে এসেছিলাম। পিছু ফিরে তাকালে আব্বুর বজ্রাহত চেহারা ঠিকই দেখতে পেতাম।

যেদিন হাসিব আংকেল স্ট্রোক করলেন সেদিন আমরা সবাই স্টার সিনেপ্লেক্সে অ্যাভেঞ্জার মুভি দেখতে গিয়েছিলাম। মুভি দেখার মাঝে বাসা থেকে বারবার ফোন আসছিল বলে সুমন বিরক্ত হয়ে ফোন বন্ধ করে দিয়েছিল। মুভি শেষে আমরা গেলাম রেস্টুরেন্টে। অনেক হৈ হুল্লোড়ে দিন পার করে বাড়ির দিকে আসতেই আম্মু ছুটে এসে বললেন ঈশান সুমনের বাবা তো নেই। তোর হাসিব আংকেল মারা গেছেন। আমি যত দ্রুত সম্ভব দৌড়িয়ে সুমনদের ফ্ল্যাটে এলাম। হাসিব আংকেল চকচকে টাইলসের মেঝেতে শুয়ে আছেন। সুমনের গগনবিদারী আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে আসছিল। কেন ফোন বন্ধ রেখেছিলাম? এই কথা বলে চিৎকার করে কান্না করার সময় ওকে কোনোভাবেই সান্ত্বনা দিতে পারিনি। আমার নিজেরও দমবন্ধ হয়ে আসছিলো। পাশের ঘরের বারান্দায় দাঁড়াতেই সুমনের মামা, চাচা ও অন্যান্য মুরুব্বির কথা শুনতে পেলাম। হাসিব আংকেলের অনেক টাকা লোন নেয়া। ফ্ল্যাটের টাকা মাত্র কয়েক কিস্তি শোধ করেছেন। এই কিস্তি এখন কে চালাবে? আর ব্যাংকের লোনই বা কে শোধ করবে? আমার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। আংকেলকে দাফনের পর বাড়ি ফিরলাম। খুব ইচ্ছে করছিল আব্বুর পাশে বসতে। ছোট বেলার মতো গলা জড়িয়ে ধরতে। দ্বিধা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত যেতেই পারলাম না।

সুমনের বাবার মৃত্যুর পর আমার চোখে বাস্তবতা নতুন করে ধরা পড়তে লাগলো। বন্ধুদের আড্ডায় সুমনকে না পেলেও সবকিছু আগের মতোই চলতে লাগল। যেন সুমন বলে আমাদের মাঝে কেউ ছিলই না। প্রায় এক মাস পর সুমনের সাথে দেখা। চেনাই যাচ্ছিল না ওকে। খুব পরিপাটি হয়ে থাকা সুমনকে নিতান্ত সাধারণ লাগছিল।

আমি আসলে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। উচ্চবিত্ত বন্ধুদের সাথে মিশে আমি ওদের মতোই তাল মিলিয়ে চলতে চাইতাম। দামি ফোন, ব্রান্ডেড কাপড়, ঘড়ি, জুতো, সানগ্লাস, বাইক, ডিএসএলআর আমার কাছে অক্সিজেনের মতোই অত্যাবশ্যক হয়ে গিয়েছিল। বাসায় এসে এসব কিনে দেওয়ার জন্য অশান্তি করতাম। আর আব্বুকে যখন তখন তাচ্ছিল্য করে কথা বলতাম। আম্মু আমাকে বোঝাতে চাইলে আরো বেপরোয়া আচরণ করতাম। মাঝে মাঝে মনে হতো বাসা ছেড়ে চলে যাই। বাসায় আমাকে ফিরতে হতো সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই। বন্ধুরা মিলে যখন রাতের লং ড্রাইভে যেত আমাকে তখন বাসায় থাকতে হতো। যাওয়ার অনুমতি মিলত না। আব্বু ছোট অথচ দৃঢ় গলায় বলতেন বয়স হয়নি। আমি অন্ধ আক্রোশে ফোঁস ফোঁস করতাম। খেতে ডাকলেও খেতাম না। ক্লাস নাইন-টেনে পড়ার সময়ও আব্বু, আম্মু আমি একসাথে খেতে বসতাম। পরীক্ষার সময় আব্বু আমাকে কতোবার যে মুখে তুলে খাইয়ে দিয়েছেন তার হিসেব নেই। এখন দুজন মানুষ খাবার টেবিলে বসে, আমাকে ডাকলেও আমি যাই না। বন্ধুদের সাথে চ্যাটে ব্যস্ত থাকি না হয় গেমস খেলায়। আমার তাদের সাথে বসে খেতে ইচ্ছা করে না। ধুর! বিরক্ত লাগে।

কয়েকদিন পর কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম সুমনরা গ্রামে চলে যাচ্ছে। কেন যাবি সুমন? ঢাকায়ই থাক না? সুমন উত্তরে বললো, 'বাবা নেই যে..... মাথার ওপরের ছায়াটা সরে গেছে এখন আমাদের কোন অভিভাবক নেই। আগলে রাখার কেউ নেই'- বলেই ডুকরে কেঁদে উঠল। কিছুক্ষণ পর সুমন চলে গেল। আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগলো আর কানে সারাক্ষণ বাজতে লাগলো 'বাবা নেই যে, মাথার ওপরের ছায়াটাও সরে গেছে।'

সত্যিই তো। আমার আব্বু যদি না থাকেন তখন কেমন হবে? আমাকে আম্মুকে কে আগলে রাখবে? আমি ঘুমিয়ে গেলেও প্রতিরাতে কে একবার হলেও মাথায় হাত রাখবে? কে জামা কাপড় কিনে দিবে? জ্বর হলে কে সারারাত মাথার কাছে বসে থাকবে? পছন্দের খাবার কিনে আনবে কে? কেই বা আমার জন্য বুক উজাড় করা স্নেহ নিয়ে মোনাজাতে দুহাত তুলো দোয়া করবে? আব্বুর কিছু হলে আমি আর আম্মু থাকবো কোথায়? গ্রামে কি আমাদেরও ফিরে যেতে হবে? আব্বুকে ছেড়ে থাকবো কীভাবে? নাহ! আর কিছু ভাবতে পারছি না। কী করে বাসায় ফিরেছি জানি না। বাসায় আসার পর থেকেই আব্বুর জন্য অপেক্ষা করছি। আব্বুটা কেন আসছে না? এতো দেরি কেন করছেন? আমার অস্থিরতা দেখে আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? আমার ছলছল চোখ দেখে মাথায় হাত রাখলেন। কলিংবেল বেজে উঠল। আমি এক লাফে ওঠে দাঁড়ালাম। দরজা খুলেই ঘর্মাক্ত ক্লান্ত মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে আব্বু বলেই বুকে ঝাঁপিয়ে পরলাম। করিস কী? করিস কী? বলেই আব্বু আমাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলেন। আমি আব্বুর ঘামে ভেজা লোমশ বুকে নাক ডুবিয়ে লোনা গন্ধটা শ্বাসের সাথে বুকের ভেতরে টেনে নিলাম। বাবারা বুকের মধ্যে এক সমুদ্র ভালোবাসা পুষে রাখেন। আব্বুর বুকে মাথা রেখে সে ভালোবাসার সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে আমি কেঁদে দিয়ে বললাম, আমার ভুল হয়েছে আব্বু। আমার কিছু চাই না। শুধু তোমাকে চাই আব্বু। তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি।

মেঘালয় হতে চেরাপুঞ্জি

রওশন আরা
জুনিয়র শিক্ষক

প্রকৃতি আমার খুব প্রিয়। আর প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে দেখার একমাত্র উপায় ভ্রমণ। সপরিবার ভ্রমণ করার মত সুখ আর কোথায় আছে? কর্ম ব্যস্ততার মাঝে সুযোগ পেলেই বের হই ভ্রমণে। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। কিন্তু এবার ভ্রমণটা ছিল কিছুটা ভিন্ন। কারণ আমরা যেখানে যেতে চাই সেখানকার পরিপূর্ণ প্রকৃতির রূপ দেখা যায় বর্ষাকালে। ৯ আগস্ট ২০১৯ ময়মনসিংহ ছেড়ে সেই প্রত্যাশিত স্থান মেঘের রাজ্য মেঘালয়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরু। যেখানে আছে সবুজ পাহাড় আর মেঘের নিবিড় আলিঙ্গন, আছে পাথরের গা বেয়ে নামা ঝরনার অবারিত ধারা। ভারতের উত্তর-পূর্বের এই শহরটিকে বলা হয় সবুজ পাহাড়ের নগর। আকাশের ঘন নীলের ফাঁকে উড়ে বেড়ায় সাদা মেঘের ভেলা। সিলেটের তামাবিল বর্ডার পেরোলেই মেঘালয় রাজ্য। পরেরদিন দুপুর ১:৩০ মিনিটে সিলেটের তামাবিল ইমিগ্রেশন পার হয়ে আমরা ভারতের এই অনিন্দ্য সুন্দর রাজ্যে প্রবেশ করি। সবুজ পাহাড়ের বুক চিরে সাপের মতো আকাঁবাকাঁ পথ, সাথে রয়েছে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। ঝরনার শীতল জল, চেরাপুঞ্জির সেভেন সিস্টার ফলসের রোমাঞ্চকর গল্প, রহস্যে ঘেরা মোসমাই গুহা, ডাউকি নদীর মনোহর রূপ আর দলছুট মেঘেদের বাধভাঙা উচ্ছ্বাস। সবই যেন আমাকে আরও ভ্রমণ পিয়াসী করে তোলে। প্রাকৃতিক শোভার কারণেই এর নাম হয়েছিল প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড। বাংলাদেশের তামাবিল সীমান্ত থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৬৫ কিলোমিটার। পাহাড়চূড়ায় অবস্থিত শিলংয়ের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪ থেকে ৫ হাজার ফুট। ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে মেঘালয় রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকে আসাম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বাংলাদেশ অবস্থিত। ১১ আগস্ট আমরা শিলং হতে বৃষ্টি সাথে নিয়েই চেরাপুঞ্জির উদ্দেশে রওনা হই। শিলং হতে ৫৪ কিলোমিটার পূর্বে ৪২৬৭ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এর স্থানীয় নাম সোহরা। এটি পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের স্থান। জুলাই মাসে এখানে প্রায় ৩৬৫ ইঞ্চি বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়। যাওয়ার পথে আমরা দেখলাম চেরাবাজার ঘিরে চেরাপুঞ্জি গ্রাম। এখানে খাসিয়াদের বসতি রয়েছে। চেরা গ্রাম জুড়ে রয়েছে কমলা লেবুর বাগান। দুপুরের খাবার খাসিয়াদের স্থানীয় রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিলাম। ধীরে ধীরে বৃষ্টি কমতে লাগলো। আবহাওয়া খারাপ থাকলে সেভেন সিস্টার ফলস মেঘে ঢেকে যায়। অবশেষে আমরা সেভেন সিস্টার-এ পৌঁছলাম।

দেখলাম পাশাপাশি সাতটি অবারিত ঝরনা ধারা। **এক পাহাড়ে পাশাপাশি সাত ঝরনা সত্যিই দারুণ! এর চারপাশের সবুজ পাহাড় আর সাদা মেঘের মেলবন্ধন যেন মায়াময় দ্বীপেরই হাতছানি দেয়। সৃষ্টিকর্তার কী অপরূপ সৃষ্টি! তারপর রওনা হলাম আরো কিছু মনোমুগ্ধ ঝরনা ও জায়গা দেখার জন্য। এদের মধ্যে নোহকালীখাই ফলস, ওয়াকাবা ফলস, ডাইন্থলেন ফলস, মকদক ভিউ পয়েন্ট, মোসমাই ক্যাভ উল্লেখযোগ্য।** মোসমাই ক্যাভ সম্পর্কে না বললেই নয়। প্রায় গোলাকার আঁকাবাঁকা পাহাড়ি এ গুহাটির দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার। গুহাটির কোথাও সরু, কোথাও প্রশস্ত। অ্যাডভেঞ্চারময় এই গুহার এক মুখ দিয়ে প্রবেশ করে বের হতে হয় অন্য মুখ দিয়ে। অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে যেতে ৩০ মিনিট লেগেছিল। যার অভিজ্ঞতা ছিল হিমশীতল ও ভয়ার্ত।

এ সকল দর্শনীয় স্থান দেখতে দেখতে কখন যে সূর্য অস্ত গেল টেরই পেলাম না। দিনান্তে আমরা চেরাপুঞ্জিকে বিদায় জানিয়ে রওনা হলাম শিলং-এর পথে।

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মৃতি থেকে

‘মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর
সমস্তই তার অধীন’
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

WALKING THROUGH THE MEMORY

Major Md Jubaer Alam
Platoon Commander
Bangladesh Military Academy, Bhatiary, Chattogram
Ex-Student CPSCM (HSC 2006)

1. Things end but memories last. The good memories are the good experiences one gets in one's life. I still remember that day of 2004, when I got admitted to Cantonment Public School and College, Mymensingh (CPSCM) in class eleven. The place where I passed the finest part of my life. The ever cherishing memories are still bright in my mind. Being one of the finest institutions of Mymensingh, CPSCM is producing thousands of stars every year.Leaving that institution almost 14 years ago, I was amazed at really how much my time at the college has influenced my doing today. I loved college but I didn't really realize how much I loved and still love it until I wrote something on it.

2. When reminisce my college days, I used to disdain waking up in the morning and dress up to go to the college. I used to think to myself every day, "Oh god! When will I grow up and there'll be no burden of studies". But now I would just do anything to go back to my those beautiful days, sit in my classroom, play flames with my friends, exchange juicy gossip on who has a crush on whom. My college life memories make me realize how important that life is for everyone. Had it not been there, I would have surely missed many things in my life. I would not be having good friends, good knowledge, good experience and good memories. The college days were very much filled with excitement. During that period, one becomes matured enough to understand the value of time.

3. My college life is a wonderful chapter of my life. In that period I learned how to direct myself towards the right path. I learned dedication, hard work and self-actualization. This is the period when I started working hard. That hard work has shaped up my career today. I believe, what we learn during college life, truly impacts the rest of our life. A beautiful campus with greenery makes the environment of CPSCM an aesthetic one. Good administration coupled with excellent set of teachers and staffs have taken the institution to an enviable stage. Any student should feel proud to be a part of CPSCM. The memories of school and college life, guide a man as a beacon in future. That life continuously plays an effective role in our later life period. While walking through the memory lane I particularly miss those bygone days of CPSCM. I truly believe that the institution will excel further in future days to come.

স্বপ্ন জাগানিয়া সিপিএসসিএম

ক্যাপ্টেন তানভীর হাসান রবিন
৩২ ইস্টবেঙ্গল, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি
প্রাক্তন শিক্ষার্থী, সিপিএসসিএম (এইচএসসি ২০১৪)

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী পরিবারের সাথে আমার যাত্রা শুরু হয় ২০০০ সালের মার্চ মাস থেকে। প্রতিটি মানুষের জীবনে ছাত্রজীবন উল্লেখযোগ্য জায়গা দখল করে থাকে এবং এই ছাত্রজীবনের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমার জীবনের চৌদ্দটি বছর কেটেছে এই প্রতিষ্ঠানে আর এখানে শুধু লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়েছে তা বলব না, আমার জীবনের প্লাটফর্ম বা ভিত্তি গঠন করে বড়ো হবার স্বপ্ন দেখিয়েছে সিপিএসসিএম। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিটি ক্লাসরুম, বারান্দা, মাঠ, ক্যান্টিন, অডিটোরিয়াম সবকিছুর সাথে আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মতোই।

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কথা না বললেই নয়, তাঁরা এক কথায় অতুলনীয়। প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগর স্কুল কলেজ থেকে বের হয়ে গেলেও সারাজীবন এই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটি থাকে অটুট। প্রতিষ্ঠানটিতে লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা, বিতর্ক ইত্যাদিতে সম্পৃক্ত থাকতে ভালো লাগত। প্রতিষ্ঠানটির পরিবেশই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে। ছোটবেলা থেকে প্রিফেক্ট ভাইয়া আপুদের দেখে নিজেরও মনে ইচ্ছা হতো আমিও একদিন প্রিফেক্ট হবো। ছোট ছোট আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা মনের ভেতর লালন করতে করতে বড় হতে থাকি নতুন কিছু শেখার মাধ্যমে এভাবেই পার হয়ে যায় চৌদ্দটি বছর।

কলেজ জীবনের শেষের দিকে এসে সিদ্ধান্ত নিলাম সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার। এই সিদ্ধান্তে আমার শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন, সকলের দোয়ায় এবং আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমি সেনাবাহিনীতে যোগদানের মাধ্যমে দেশের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। আশ্চর্যজনকভাবে এই প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত প্রতিটি শিক্ষাই আমার সেনাবাহিনীতে চান্স পাওয়া থেকে শুরু করে আজও আত্মবিশ্বাসী হতে প্রেরণা যোগাচ্ছে।

আমি মনে করি অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শিক্ষকের আদর্শকে নিজের ভেতর লালন করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে, তবে তারা সফল হবেই হবে। এগিয়ে চলুক আমার স্বপ্ন- জাগানিয়া সিপিএসসিএম পরিবার।

আমার প্রেরণা সিপি-এসসি-এম

এ, এ, টি হাসান খান তুলন
শিক্ষার্থী-বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ বর্ষ
প্রাক্তন শিক্ষার্থী, সিপিএসসিএম (এইচএসসি ২০১৫)

শুভেচ্ছা সবাইকে। আমি এ.এ.টি. হাসান খান তুলন। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়নরত। আমাদের প্রাণপ্রিয় বিদ্যাপীঠে আমার পথচলা শুরু হয় ২০০২ সালে কেজি শ্রেণিতে। মজার বিষয় হচ্ছে, প্রথমবার ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারিনি, দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় সফল হই। এরপর সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর আমার পদচারণা ছিল এই ক্যাম্পাসের সর্বত্র। ২০১৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করি। কিন্তু আজও এই বিদ্যাপীঠ আমার চেতনায় সবর্দা জাগ্রত।

কেজি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিতেই পেয়েছি সম্মানিত শিক্ষকদের দিক-নির্দেশনা, তাঁরা যুগিয়েছেন চলার পথের পাথেয়। আজকের এই আমি হয়ে ওঠার পেছনে আমার পরিবারের যেমন অবদান রয়েছে, তেমনিভাবে রয়েছে পূজনীয় শিক্ষকদের বিশাল ভূমিকা। তাঁদের জন্য আমি আজ এই অবস্থানে আসতে পেরেছি। স্কুল জীবনে আমি পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে সরকার প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করি। এর পেছনে রয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের অসামান্য অবদান, বিশেষ করে প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে বিশেষ ক্লাস ও পরীক্ষার আয়োজন করা হয়ে থাকে, একজন ছাত্র হিসেবে তা আমার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।

সিপিএসসিএম এ অধ্যয়নকালে আমার ক্ষুদ্র জীবনে জমা হয়েছে অগণিত স্মৃতি যা বলে শেষ করা যাবে না। প্রিয় শিক্ষকদের ভালোবাসা স্নেহভরা বন্ধুদের সাথে খুনসুটি, দুষ্টুমি, টিফিন পিরিয়ডের সময় হৈ-হুল্লোড়, বাস্কেটবল মাঠে খেলা-এই স্মৃতিগুলো রয়ে যাবে আজীবন। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ইনডোর গেমস, আউটডোর গেমস নিয়ে এখনো নস্টালজিয়ায় কাটাই। আর সেইসাথে একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ মানস গঠনের ভিত মজবুত করার ক্ষেত্রে এই বিদ্যাপীঠের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর ভূমিকা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

পড়াশোনার কথা যদি আবারও বলি, আমার মনে হয় না ময়মনসিংহের আর কোনো স্কুল বা কলেজে আমাদের প্রতিষ্ঠানের মতো নিষ্ঠার সাথে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষা নেয়া, সম্পূর্ণ সিলেবাস ক্লাসেই শেষ করা, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া-এই বিষয়গুলোতে আমাদের স্কুল এন্ড কলেজ অনন্য। আর ছোট ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে বলব, লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমগুলোর যেটা তোমার ভালো লাগে, তাতে অংশগ্রহণ করো। জীবনটা উপভোগ করো, সমাজ ও দেশ সম্পর্কে সচেতন হও। সর্বোপরি নিজেকে একজন সৎ ও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলো। সবাই যেন নিজের পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম উজ্জ্বল করতে পারি-এই মর্মে আমরা উজ্জীবিত হই। এটাই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।

আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে সিপিএসসিএম

মো. জাহিদুল ইসলাম
শিক্ষার্থী-ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ২য় বর্ষ
প্রাক্তন শিক্ষার্থী, সিপিএসসিএম (এইচএসসি ২০১৮)

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কোথা থেকে শুরু করব কিংবা কোথায় এর যবনিকা টানব সেটা নির্ধারণ করা বরাবরই আমার পক্ষে দুষ্কর। তারপরও স্মৃতিচারণের সুযোগ যখন পেয়েছি তখন একটি কথা না বললেই নয়, এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে আমার স্মৃতিগ্রন্থের প্রায় পুরোটাই সুখময় অধ্যায়ে পূর্ণ। এর সমগ্র কৃতিত্ব দিতে চাই পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের। জাতির চালিকা শক্তি বলা হয় শিক্ষকদের, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও মূল শক্তি তাঁরাই। আর আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে এই কথাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রযোজ্য। পড়ানোর দক্ষতায় তাঁরা যেমন অনন্য, একইসাথে তাঁরা দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক মানোন্নয়নেও। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকবে সকল শিক্ষকের প্রতি, যাঁরা আমার জীবনবোধের জায়গাগুলো প্রসারিত করেছেন। **স্বল্প শব্দে শুধু এটুকুই বলব, শিক্ষাজীবন যখন তাঁদের মত দক্ষ, স্নেহময়, অনন্যসাধারণ শিক্ষকদের স্পর্শে ধন্য হয়, তখন আমাদের মত সাধারণ শিক্ষার্থীর উপর আমাদের শিক্ষকদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ব্যাপক দায়িত্বও অর্পিত হয়। আশা করব, আমরা কখনোই আমাদের শিক্ষকদের ভাবমূর্তি কোথাও ক্ষুণ্ন করব না, কেননা তাঁদের স্নেহময় আশীর্বাদ সর্বদা ছায়া হয়ে বিরাজ করে।**

আমি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর শিক্ষকদের হাত ধরেই মেডিকেলের দরজায় পদার্পণ করার সুযোগ পেয়েছি। এ প্রতিষ্ঠানটি আমার চিরদিনের জন্য স্মৃতির মোড়কে ধরে রাখার মত কিছু সুসময় উপহার দিয়ে গিয়েছে অকৃপণভাবে। হ্যাঁ, দিয়েই গিয়েছে কেবল, বিনিময়ে হয়ত কিছুই দিতে পারিনি।

এখানে যেমন মূলধারার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাটি গ্রহণের সুযোগ পেয়েছি, তেমনি সহশিক্ষা কার্যক্রমেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি। জুটেছে কিছু সাফল্যও। এর মাঝে দুটির কথা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। **২০১৩ সালে স্কুলে থাকাকালীন মাছরাঙা টেলিভিশনে প্রচারিত 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' কুইজ শোতে দেশের সকল খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া। আর ২০১৭ সালে কলেজে থাকাকালীন জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত বারোয়ারি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার গ্রহণ করা।**

এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের সময় বছরব্যাপী বিতর্ক, সাধারণ জ্ঞান, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, রচনা লিখনসহ নানা ধরনের প্রতিযোগিতায় জেলা, বিভাগ কিংবা জাতীয় পর্যায়ের সাফল্য লাভের জন্য শিক্ষকদের প্রতি আমার

সীমাহীন কৃতজ্ঞতা। সবচেয়ে উল্লেখ করার মত বিষয় হল, স্কুলে থাকাকালীন এসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ মোটেই আমার পাঠ্যক্রমিক শিক্ষাকে বিঘ্ন ঘটায়নি বরং শিক্ষকদের দিক-নির্দেশনায় পরীক্ষাতেও সন্তোষজনক ফল অর্জন করতে সচেষ্ট হয়েছি।

একজন শিক্ষার্থীর জন্য শৃঙ্খলাবোধের চর্চা অত্যন্ত অপরিহার্য, পরবর্তী জীবনেও এর প্রভাব অপরিসীম। এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর জন্য শৃঙ্খলা শিক্ষার অনন্য দৃষ্টান্ত। এমনকি এখন মেডিকেল কলেজের কোন শিক্ষক যখন জানেন যে আমি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী থেকে পড়ে এসেছি, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমার প্রতি তাঁদের একটি ভাল ধারণা তৈরি হয়। এর কৃতিত্বও দেব এই প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা চর্চার দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়া যশকে।

একবাক্যে, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী আমার কাছে একটি পরিবার। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীকেও আমি আপনজন হিসেবেই পেয়েছি এবং তাদের সকলের সহায়তা আমার শিক্ষাজীবনকে অনেকখানি মসৃণ করেছে।

শিক্ষকদের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, অন্তেও তাঁদেরকেই স্মরণ করতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সবচেয়ে বড়গুণ শিক্ষার্থীদের সাথে একটি সহজ ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার দক্ষতা। স্নেহমাখা শাসনে তাঁরা নিশ্চিত করেন শিক্ষার সুনিপুণ পরিবেশ। ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের প্রতি আমি সীমাহীন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়েছি। আমার প্রতি তাঁরা যেভাবে সহায়তার হাত প্রসারিত করেছেন এর প্রতিদান আমি দিতে পারব না কোনোদিন। এই জায়গাতে বিশেষ একটি কথা বলতেই হচ্ছে। কলেজে ভর্তির সময় যখন পারিবারিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলাম তখন একজন শিক্ষক আমার পাশে যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন সেই ঋণ জাগতিক কোন কিছু দিয়ে শোধের উর্ধ্বে। নামোল্লেখে তাঁর অবদানকে সীমাবদ্ধ করার বাতুলতা করব না। শুধু এটুকুই বলব, কোনোদিন কোনো প্রয়োজনে যেন আপনার পাশে এই ছাত্রটি থাকতে পারে- এই আশীর্বাদ করবেন।

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণার এই নতুন সংযোজনটি চমৎকার উদ্যোগ। শিক্ষার্থী থাকাকালীন ম্যাগাজিনে লিখেছি, প্রাক্তন হয়েও লিখতে পারছি। অসাধারণ অনুভূতি! মহৎ এই পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

পরিশেষে এটিই বলব, প্রাক্তন-বর্তমান সকলের সমন্বিত অবদানে এগিয়ে যাক আমাদের প্রাণের প্রতিষ্ঠান। সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখুক আমাদের প্রাণের ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী।

শিক্ষার্থীদের চেতনা থেকে

‘ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্ট্যটা থাকা দরকার
তা হলো প্রশ্ন করার ক্ষমতা, তাদের প্রশ্ন করতে দিন।’
-এ.পি.জে আব্দুল কালাম

সূচি

প্রবন্ধ	৮৩-৯৬	১১১-১২০	কবিতা ও ছড়া
ভ্রমণ কাহিনী	৯৭-৯৯	১২২-১২৩	জানা-অজানা
গল্প	১০০-১০৬	১২৪	হাসতে নেই মানা
কল্পকাহিনী	১০৭-১০৯	১২৫-১২৬	ধাঁধা
রম্য রচনা	১১০	১২৭	কৌতুক

অধ্যবসায় ও সাফল্য

শাওরিন ইসলাম সেমন্তি
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা- A, রোল-২

সাফল্য লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। প্রত্যেক মানুষই চায় জীবনে সফল হতে, নিজের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে। সকল মানুষের মতো আমিও তার ব্যতিক্রম নই। তাই নিজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রবল বিশ্বাস নিয়ে বাবা-মার হাত ধরে যেদিন এসেছিলাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী প্রাঙ্গণে সেদিন এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে নিজের ছোটমনে অজান্তেই এঁকে ফেলেছিলাম একটা স্বপ্ন-আমি বড়ো হবো। কিন্তু পারবো তো? সেই স্বপ্নের পথ ধরেই আমি এখনো হাঁটছি। জানিনা এর শেষ কোথায়। তবে থেমে যাব না, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে চলেছি। ছোটবেলা থেকেই শুনেছি, জীবনে লক্ষ্য অর্জন করতে হলে প্রথমেই যেতে হবে বিদ্যালয়ে, কারণ মা বলতেন, "সাফল্য লাভের জন্য যাবতীয় গুণাবলি এবং জ্ঞানের বিকাশ গড়ে ওঠে বিদ্যালয় থেকেই।" কথাটা যে কতটা সত্যি, তা আমি ধাপে ধাপে বুঝতে পেরেছি।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে পেয়েছি শিক্ষকদের স্নেহ, ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণা। আমার মা এই স্কুলেরই শিক্ষক। হয়তোবা এ কারণেই এ স্কুল এবং স্কুলের সকল শিক্ষকের প্রতি একটা আলাদা দুর্বলতা আছে আমার। তাই তাঁরা যা বলতেন, তা মেনে চলতে চেষ্টা করেছি সবসময়। ফলে স্কুলের যেকোনো ধরনের কাজে যথাসাধ্য অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। এরই ধারাবাহিকতায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করি বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে। গান দিয়ে শুরু হয় আমার এই পথচলা।

চার বছর বয়স থেকে গান শিখি। তাই স্কুলের যে কোনো প্রতিযোগিতা বা অনুষ্ঠানেই আমি অংশগ্রহণ করি। নার্সারিতে পড়ার সময় প্রথম আন্তঃহাউস বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ছড়াগানে অংশগ্রহণ করে প্রথমস্থান অধিকার করি। এটি ছিল আমার জীবনের প্রথম কোনো কিছুতে সাফল্য অর্জন। এখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও বেশি করে অংশগ্রহণ করতে শুরু করি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এবং প্রতিবারই সাফল্যের ছোঁয়া পাই। নিজ স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে একসময় বেরিয়ে পড়ি বাইরের জগতে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে। সেসব ক্ষেত্রেও অর্জন করি আশানুরূপ ফলাফল।

২০১৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় ইসলামিক সাংস্কৃতিক পুরস্কার প্রতিযোগিতায় হাম্‌দ-নাত এ অংশগ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করি। পুরস্কার গ্রহণ করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে। তখন আমি পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী। এ অর্জনটি আমার জন্য ছিল তখন পর্যন্ত পাওয়া সেরা সাফল্য। এ অর্জনটি আমার ভেতরের আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

২০১৬ সালে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করি। পুরস্কার গ্রহণ করি মহামান্য রাষ্ট্রপতির হাত থেকে। সেটা ছিল নিঃসন্দেহে আরও একটা স্বপ্নপূরণ। এই প্রতিযোগিতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ভাবলাম, শুধু গান নয়, অন্যান্য বিষয়েও আমার অংশগ্রহণ করতে হবে। সেই থেকে রচনা, সাধারণজ্ঞানসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করি স্কুলে ও স্কুলের বাইরে বৃহত্তর পরিসরে। সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় সবকটিতেই সফলতার মুখ দেখি।

২০১৮ সালে 'শুদ্ধ স্বরে জাতীয় সংগীত' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করি এবং গোল্ড মেডেল অর্জন করি। এভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য লাভ করি। একাধিকবার পুরস্কার গ্রহণ করেছি মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, ধর্মমন্ত্রীসহ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের হাত থেকে। যা সত্যিই আনন্দের ও গৌরবের। জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সান্নিধ্য লাভ করেছি অনেক গুণী সংগীত শিল্পীর, যাঁরা বিচারকের আসনে ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং তাঁদের আশীর্বাদ লাভ করেছি।

অনেকের হয়তো একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, পড়াশোনার বাইরে অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। সে ধারণার কোন ভিত্তি নেই, বরং আছে নিজেকে দাবিয়ে রাখার মত দুর্বল মানসিকতা। আমি নিজে প্রমাণ পেয়েছি, এ ধারণা অমূলক। সকলের দোয়ায় এবং সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় বরাবরই আমি ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করেছি।

এছাড়া, যে অর্জনটি আমার স্মৃতিতে সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে আছে, তা হলো আমার ইন্ডিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ আয়োজনে ভারত সফরের একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। এটি আয়োজিত হয়েছিল মূলত একদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অন্যদেশের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী পরিচালিত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ১০ জন শিক্ষার্থীকে বাছাই করা হয়, যাদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন। আমাদের টিমে ছিল মোট ১৪ জন; ১০টি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের ১০ জন শিক্ষার্থী এবং এই শিক্ষার্থীদের তথা আমাদের গাইড করার জন্য দুজন শিক্ষক এবং দুজন আর্মি অফিসার। আমাদের টিম লিডার ছিলেন লে. কর্নেল জুবায়ের রহমান স্যার।

ইন্ডিয়া ভ্রমণে গিয়ে জানতে পারি তাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে, খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয় তাদের সংস্কৃতিকে। তাদের দেশের সেনাবাহিনী পরিচালিত স্কুলগুলো আমাদের ঘুরিয়ে দেখানো হয়। সেখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা অংশগ্রহণ করি। এছাড়াও ইন্ডিয়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানও আমরা ভ্রমণ করি। সে দেশের অনেক গুণীজনের সাথে আমাদের দেখা করার এবং মতবিনিময় করার সুযোগ হয়। অনেক কিছু শিখতে পারি তাঁদের কাছ থেকে। তাঁদের দেশের সংস্কৃতিকে জানার পাশাপাশি আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেও আমরা তাঁদের সামনে তুলে ধরি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

এভাবেই পড়াশোনার পাশাপাশি সব ধরনের কাজের সাথেই নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি। তবে তা পড়াশোনার ক্ষতি করে নয় বরং চেষ্টা করেছি সবকিছু সমান তালে এগিয়ে নিতে। সকলের দোয়া ও অনুপ্রেরণায় এবং সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় সফলতার স্পর্শ পেয়েছি সবসময়।

স্কুল জীবন শেষ করে এখন কলেজ জীবনে পা রেখেছি। জানি এই কলেজ জীবনটাও খুব অল্প সময়েই শেষ হয়ে যাবে। তবে আমার এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা ও ইচ্ছেটা কখনো শেষ হয়ে যাবে না। বরং এতদিন যেভাবে সকলের আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে চলেছি, ইনশাল্লাহ্ ভবিষ্যতেও সেভাবে এগিয়ে যাবো। আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষা মানে শুধু বইয়ের পাতায় সঞ্চিত থাকা জ্ঞানকে অর্জন করা নয়, বরং জীবনে প্রত্যেক পদক্ষেপ থেকেই গ্রহণ করা যায় শিক্ষা। এই বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলেছি এবং জীবনের বাকি অংশটুকু এই বিশ্বাস নিয়েই এগিয়ে যেতে চাই বহুদূরে।

করোনায় শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন

সুমাইয়া মিথী
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-A, রোল-৩৯১

বাংলাদেশে গত ৮ মার্চ ২০২০ প্রথম করোনা ভাইরাস সনাক্তের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ধাপে ধাপে এ বন্ধের মেয়াদ বাড়ানো হয় UNESCO এক প্রেস রিলিজে জানায় যে Covid-19 পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বিশ্বের প্রায় ১৬৫টি দেশে ১.৫ বিলিয়ন শিক্ষার্থী পড়াশোনা থেকে বিচ্ছিন্ন। এ অবস্থায় সংস্থাটি Learning Never Stops স্লোগানে বৈশ্বিক শিক্ষা সমঝোতা বা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়। মাইক্রোসফট, ফেইসবুক, গুগল, জুম এর মতো বিশ্বের বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান তাদের এই ঐক্যে যুক্ত হয়েছে। বিশ্বের সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইউনেস্কো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য শিক্ষা বিষয়ক যে গাইডলাইন প্রকাশ করেছে সেখানে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার কথা উল্লেখ করেছে। দশটি সুপারিশের মধ্যে বলা হয়েছে ডিজিটাল টুল ব্যবহার করে শিক্ষকদের ক্লাস নেয়া এবং বিভিন্ন মাধ্যমে সম্প্রচার করা। তাই শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সাথে যুক্ত রাখার নিমিত্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে বাংলাদেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে তাদের পাঠদান কার্যক্রম শুরু করে, যা এখনো চলমান।

বৈশ্বিক এই করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে একদম মাঠ পর্যায় পর্যন্ত প্রযুক্তির এই ব্যবহার কিছুদিন পূর্বেও অভাবনীয় ছিল। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট ব্যবহার করে, গুগল ক্লাসরুম, জুম অ্যাপ এবং অনেকক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সাথে সহজতর উপায়ে সংযুক্ত হওয়ার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যথাযথ পাঠদান করছে।

অনলাইন ক্লাস শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধাজনক। সশরীরে উপস্থিত থাকা ব্যতীত একাডেমিক ক্লাসের সঙ্গে অনলাইন ক্লাসের তেমন পার্থক্য নেই। একাডেমিক ক্লাসে সশরীরে উপস্থিত থেকে ক্লাস করতে হয়, লেকচার নোট করতে হয়। কিন্তু অনলাইন ক্লাস এই বিষয়টিকে সহজ করে দিয়েছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকরা খুব সহজে বিভিন্ন ডিজিটাল কন্টেন্ট যেমন: ভিডিও, এনিমেশন, ত্রিমাতৃক মডেল ইত্যাদি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পাঠ সহজে অনুধাবন করতে সহায়তা করছে। এছাড়া কোনো কারণে ক্লাস করতে না পারলে পরবর্তীতে আবার দেখার জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কোচিং ও গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীলতা কমে আসা। দেশের নামকরা প্রতিষ্ঠানের সেরা শিক্ষকদের বিষয় ও শ্রেণিভিত্তিক ক্লাস যেখানে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে সেখানে কোচিং ও গাইড বইয়ের প্রয়োজনতো শিক্ষার্থীর নিকট কমে যাবেই। অনলাইন ক্লাসের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহবন্দি একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য এসেছে। সকলের বইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ছে, যা তাদের শিক্ষা জীবনেও খুব প্রয়োজন। ক্লাস করার জন্য শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে ঘুম থেকে ওঠে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীও এর ব্যতিক্রম নয়। করোনায় শুরু থেকে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী পরিবার সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয়ের দিক-নির্দেশনায় অনলাইন এর মাধ্যমে সকল কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে সকল শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শুরুতে জুম এর ধারণাটি সকলের কাছে অপরিচিত থাকলেও কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার সাথে সাথে সকলেই জুম ব্যবহারের কলা কৌশল আয়ত্ত করে জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে ঘরে অবস্থান করা, মাস্ক ব্যবহার করা, বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে না যাওয়া এবং শরীর ও স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছে। সিপিএসসিএম এর এই মহতী উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রযুক্তির এই যুগে প্রাথমিক দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে বাংলাদেশের ই-লার্নিং কার্যক্রম ভবিষ্যতে ক্লাসরুমভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি কার্যকরভাবে চালু থাকবে বলে মনে করি। বাংলাদেশ সকল সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে অনলাইনভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে এগিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশা রাখি।

নারীশিক্ষা : ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন

ফারিহা জালাল

শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা- B, রোল-৮৪

একটি প্রবাদ রয়েছে, একজন পুরুষকে শিক্ষা দেয়া মানে একজন ব্যক্তিকে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলা। আর একজন নারীকে শিক্ষা দেয়া মানে গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা। জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতিতে নারীশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাই বর্তমান সরকার নারীশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। কেননা, নারী সমাজেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নারী পুরুষের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশ যেমন এগিয়ে যাবে, তেমনি দেশের উন্নয়নে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও নারীর অবদান দৃষ্টিগোচর হবে, যা ইতোমধ্যে চোখে পড়ার মতো। কাজেই নারীর উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

শিক্ষা জাতি গঠনের শুধু মূল স্তম্ভই নয়, শিক্ষার মাধ্যমে একটি জাতি উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যায়। একটি রাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণির নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়লে দেশ অগ্রগতি, উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এক সময় বাঙালি নারীসমাজ শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল। শিক্ষা-দীক্ষা ও বাইরের পরিবর্তিত দুনিয়ার সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয় ছিল না। নারীর জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া তাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসার পথ দেখালেন। তিনি যে, নারীশিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত করেন সেই আলোয় আলোকিত হলো নারীসমাজ। ফলে সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে নারী শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হয়ে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। বর্তমান নারীসমাজ শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছে। আজ নারী অন্ধঅনুকরণ থেকে মুক্ত। সব ধরনের জড়তা, কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনসত্তা ও একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এ সংগ্রামে তারা অনেকটাই জয়ী। শিক্ষার আলো তাদের এই পথ দেখিয়েছে। শিক্ষাই তাদের পৌঁছে দিচ্ছে সাফল্যের সুউচ্চ শিখরে। আজ নারী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আপন মহিমায় ভাস্বর। তাই নারী আজ ঘরের কোণে সেকালের মতো বন্দি থেকে অন্ধ অনুকরণ ও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে নেই। শিক্ষা তাদের অন্তরকে জাগ্রত করেছে।

এ কথা আজ বলতে দ্বিধা নেই যে, শিক্ষা ছাড়া নারীর অবস্থান পরিবর্তন সম্ভব নয়। কারণ শিক্ষা শুধু জাতির প্রতিটি নাগরিকের আত্মাকে জাগ্রত করে না, জাতির প্রতিটি নাগরিককে জাগ্রত করে। দেশকে উন্নয়ন, অগ্রগতি, সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। যুগে যুগে নারী-পুরুষের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশ এগিয়ে গেছে সমৃদ্ধির পথে। আজকে সমাজে নারীর অগ্রগতি আমাদের আশান্বিত করে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শুধু পুরুষ নয় এগিয়ে চলেছে নারীও, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ পথে নারীর নানা বাধা-বিপত্তি থাকলেও শিক্ষা, চাকরি, নারীর ক্ষমতায়নসহ নানা ধরনের চ্যালেঞ্জিং পেশায় যুক্ত থেকে দেশ এবং জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে কাজ করে যাচ্ছে আজকের নারী।

বেগম রোকেয়া যে নারী জাতির অগ্রগতি ও উন্নয়নের কথা ভেবেছিলেন তা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। সমাজ ব্যবস্থার আরোপিত শৃঙ্খল ভেঙে আত্মবিশ্বাসে নারী সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। বেগম রোকেয়ার জন্ম যদি না হতো তাহলে ভারত উপমহাদেশে বাঙলার নারী এখনও সে অন্ধকার যুগেই পড়ে থাকত। তাই তিনি অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে বাঙালি নারীদের মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছেন। সেই শিক্ষার আলোয় আজ বাংলার নারী আলোকিত জীবন পেয়েছে। তাই তারা অগ্রগতির পথে, উন্নয়নের পথে ধাবমান। তাদের চিন্তা চেতনা আজ শুধু রান্না ঘরে সীমাবদ্ধ নয়। পুরুষের সঙ্গে তারাও সমানভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, জাতীয় সংসদের স্পিকারসহ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ৭০ জন নারী সদস্য রয়েছেন। তা ছাড়া জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, বিচারপতি, পাইলটসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। পাশাপাশি নারীরা বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন। এমনকি এভারেস্টও জয় করেছে।

সুতরাং, প্রকৃত শিক্ষার আলো প্রবেশ করাতে হবে নারীর সুকোমল মানসপটে, যাতে করে একজন নারী সামাজিকভাবে সাবলম্বী হয়ে বেড়ে ওঠতে পারে। তবে এ বেড়ে ওঠার পথে নারী নির্যাতনসহ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। কেননা, নারী সমাজেরই অর্ধাংশ। তাই নারীকে বাদ দিয়ে সমাজ এগিয়ে যাবে না। নারী শিক্ষার প্রসারে দেশের উন্নয়নে নারীদের অবদান যেমন বাড়বে, তেমন রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও নারীর ক্ষমতায়নও ঘটবে। কাজেই নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

পরিশ্রম ও সফলতা

মো. আব্দুল্লাহ্ আল মামুন রিয়াদ
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা- D, রোল-২৭১

ইতিহাস যখন বলছে মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার আগুন, চাকা কিংবা কম্পিউটার, তখন আমরা বলছি এই সভ্যতা বিনির্মানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার আত্মবিশ্বাস। আমাদের সফলতার জন্য শুধু আমাদেরকেই লাগবে। ক্লাসের ফার্স্টবয়ের সাথে প্রতিযোগিতা হয় ক্লাসের সেকেন্ড বয়ের সাথে, লাস্ট বয়ের সাথে নয়। আর আজ যারা ফার্স্টবয় হতে পাগল, তাদের হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। আজ থেকেই স্বপ্ন দেখতে হবে নিজের নাম ইতিহাসে এন্ট্রি করে নেওয়ার জন্য। আমরা চাইলেই ইতিহাস লেখা হবে নতুন করে। আজকের ব্যর্থতাই কালকের অনুপ্রেরণা। আমরাই আমাদের ক্যারিয়ারের শ্রেষ্ঠ স্থপতি। মনে রাখতে হবে, যারা ব্যর্থ হয়ে হাল ছাড়েনি, তারাই চূড়ান্ত বিজয় দেখেছে। অতীতে যে যত বেশি বাধা ডিঙাতে পেরেছে, তারাই সবচেয়ে বড় সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। সাহসীরা ভাগ্যকে গড়েন আর অলসেরা ভাগ্যকে দোষারোপ করেন। ব্যর্থতার মধ্যে পড়ে যখন আমাদের সাহসী কণ্ঠে বেজে ওঠবে "Do or Die" তখন আত্মবিশ্বাসীরা বলবে "Die or Do" মানুষ ব্যর্থ হতে হতেই সফল হয়। আমরা কত বড় বিখ্যাত হবো, তা নির্ভর করবে আমরা কত বড় বাধা অতিক্রম করতে পেরেছি তার ওপর। এই পৃথিবীতে কেউ কাউকে সুযোগ দিবে এমন চুক্তিতে কেউ জন্মায় নি বরং জন্মের পর হাজারো মানুষ প্রস্তুতি নিচ্ছে কীভাবে অন্যকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া যায়। তাই এখন স্বপ্ন দেখার সময়, ওঠে দাঁড়ানোর সময়, চ্যালেঞ্জ নেয়ার সময়। বিল গেটস কীভাবে শূন্য থেকে উঠে এসেছেন, যে ছেলেটি রিক্সাচালকের ঘরে জন্ম নিয়ে বিসিএস ক্যাডার হয়েছেন, তাদের সফলতার গল্পগুলি আমাদের এগিয়ে যাবার পথে প্রেরণা হিসেবে কাজ করতে পারে। আমরা নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করব যেন সফলতার পিছনে আমরা নয় বরং সফলতাই আমাদের পিছনে দৌড়ায়। আমরা নিজেদের দুর্বলতাগুলোকে শক্তিশালী গুণে পরিণত করতে পারলেই সফলতা আমাদের পিছু ছাড়বে না। যারা বড় কিছু হয়েছেন, তাঁরা তাদের স্বপ্নগুলো নিজেরাই দেখেছে। একটা স্ট্রং সিদ্ধান্তই বদলে দিতে পারে জীবনের সব হিসেব-নিকেশ। জানি, আমরা সফল হবোই, বৃথা যাবে না আমাদের পরিশ্রম। **সাকসেস হওয়ার জন্য আমাদের সুপারম্যান হতে হবে না, স্পাইডারম্যানও হতে হবে না শুধু জেন্টেলম্যান হলেই চলবে। জীবন বদলায় না, জীবনকে বদলে দিতে হয়। আমাদের দ্বারাই সব সম্ভব, আমরা শুধু নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখব। সব বিশ্বাস হারিয়ে গেলে যাক, আমাদের আত্মবিশ্বাস যেন না হারায়। কারণ এই আত্মবিশ্বাসটুকুই আমাদের তৈরি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।** আমরা সিস্টেমকে পাল্টে দেব, সমাজকে পাল্টে দেব এমনকি এই পৃথিবীটাকেও পাল্টে দেব। তার আগে তো আমাদের নিজেদেরকেই পাল্টাতে হবে। পরিশ্রম সফলতার চাবিকাঠি। সফল হওয়ার মূলমন্ত্র এটাই। আগে সবার সমান হবো, তারপর সবাইকে ছাড়িয়ে যাবো। আমরা পরিশ্রম করব, সফলতা আসবেই।

জীবনসূর্য

মো. শিহাবুন্নবী
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা- C, রোল-২৫২

পৃথিবীর বিশালতার মাঝে মানব জীবন অতি ক্ষুদ্র। প্রতিটি মানুষের আগমন কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য। এই বিশাল পৃথিবীর মাঝে আমি, ভাবলে যেমন নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য মনে হয়, তেমনি মানবজীবন সাহসিকতায় উদ্বেলিত হয়। যে সাহসিকতাকে সামনে রেখে তাকে সত্য মনে করে, সেই এগোতে পারে। তখন আসে সফলতা, তখন মানবজীবন হয় সার্থক সুন্দর ও গৌরবময়।

> মানব জীবনের চলার পথেও বাধা আসে। তবে বাধাকে বাধা না মনে করে তাকে জয় করে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে মানব জীবনের সার্থকতা প্রকাশ পাবে। মনে রাখতে হবে বিপদ মেঘের মতই ক্ষণস্থায়ী। এক সময় আকাশ মেঘমুক্ত হবেই আর সূর্য তার আলো ছড়াতেই থাকবে। পথচলা হবে আবারো আনন্দময়।

মানবজীবনকে অনেকে অনেক কিছুর সাথে তুলনা করেছেন। যেমন-রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন নদীর সাথে, মোতাহের হোসেন চৌধুরী তুলনা করেছেন বৃক্ষের সাথে। আসলে মানব জীবনের সার্থকতা যদিও বৃক্ষের মধ্যে বেশি পরিলক্ষিত হয়, তবে বৃক্ষের সার্থকতা যার ওপর নির্ভরশীল তাকে নিয়ে আলোচনা শ্রেয়।

মানবজীবনের শুরু হয় তার জন্মের মাধ্যমে। অন্যদিকে দিনের শুরু হয় সূর্যোদয়ের মাধ্যমে, যার আলোতে পৃথি বী আলোকিত হয়। সূর্যোদয়ের উদ্দেশ্য আমাদের জানা থাকলেও মানব জীবনের আবির্ভাব কীসের কারণে, তা তার বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রকাশ পায়।

সূর্যের উদয়ের মাধ্যমে একটি নতুন দিনের সূচনা হয়। সূর্য তার দীপ্তি ছড়াতে ছড়াতে উদিত হয় আকাশে। এক সময় তার পূর্ণ রূপের প্রকাশ ঘটে, তখন আমরা তাকে দেখতে পাই। মানব জীবনের আবির্ভাব ঘটে মানব সমাজে, পরিবারের মধ্যে। প্রকৃতি ভোরের সূর্যকে যেমন সাদরে গ্রহণ করে, পরিবারের সদস্যরা সদ্যজাত মানব সন্তানকে সেভাবে গ্রহণ করে অত্যধিক আনন্দের সাথে। সে তার ঔজ্জ্বল্য পরিবারের মধ্যে ছড়াতে থাকে, যেমন করে সূর্য তার আলো ছড়ায় পৃথিবীর বুকে। পরিবার ও সমাজের মধ্যে বিকশিত হতে থাকে তার জীবন। সে থাকে পবিত্র ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী ভোরের সূর্যের মত।

সূর্য সময়ের ব্যবধানে ওপরে উঠতে থাকে, যেন প্রতিটি সময় শুধু বেড়ে ওঠার। সে তার উজ্জ্বল আলোয় আরও দীপ্ত হতে থাকে। তার রং হতে থাকে গাঢ়। হঠাৎ পরিবর্তনে তখন তার মধ্যে অসীম শক্তির আবির্ভাব ঘটে, সে তপ্ত করে দেয় পুরো নভোমণ্ডলকে। ওঠতে ওঠতে সে এক সময় মাথার ওপর চলে আসে এবং তার মধ্যে পূর্ণতা ঘটে।

মানুষের জীবনও বিকশিত হতে থাকে এবং এক সময় শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করে। তার জীবনে শুরু হয় নতুন অধ্যায়। সবকিছু বুঝতে থাকে ও সব কিছু জানতে থাকে, সবকিছু শিখতে থাকে। পরবর্তীতে পদার্পণ করে বয়ঃসন্ধিকালে যা মানব জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় তার মনের চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটে। তার ভেতরে শক্তির সঞ্চার হয় এবং এক সময় যুবকে পরিণত হয়। তখন তার শরীরে অসীম শক্তির আবির্ভাব ঘটে, যেন তার যা

ইচ্ছা তাই সে করতে পারবে। এই অসীম সাহসিকতার মধ্য দিয়ে মানুষ তার নাম, যশ ও খ্যাতি গড়ে তোলে। সময়ের পরিক্রমায় সূর্য হেলে পড়তে থাকে পশ্চিমের দিগন্তে। তার ক্ষীণ আভা ছড়াতে থাকে, যেন সে বার্ধক্যে নত। কালের সাথে মানুষও সংসার জীবনে আবদ্ধ হয়। তার জীবনেও শুরু হয় নতুন গল্প। মানুষ তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে জীবনের সন্ধানে। তার জীবন অতিবাহিত হতে থাকে এক রহস্যময় সময়ের মাঝে। কালের সাথে সেও প্রবেশ করে মানবজীবনের আরেক অধ্যায়ে-যা বৃদ্ধকাল। তার মনের তেজ, সেই অসীম সাহসিকতা আর থাকে না। যেন তা বিলীন হয়ে যায় কোন অজানা গহ্বরে, যেন তার কোনো সন্ধান নেই। মানুষ এই সময়ে অর্থাৎ মানব জীবনের শেষ সময়ে উপস্থিত হয়ে তার জীবনের সার্থকতা খোঁজে আর নিজেকে প্রশ্ন করে কী করেছি জীবনে? কীভাবে আমি আমার সময় ব্যয় করেছি? আসলে সময়ের অপচয় এক সময় জীবনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। শেষ সময়ে যে আপসোস করতে থাকে।

পশ্চিমে সূর্য তার দীপ্তি হারিয়ে ফেলে। মানুষও তার শেষ সময়ে উপনীত হয় এবং এক সময় সে প্রকৃতির কাছে সমর্পিত হয়।

এখানেই মানব জীবনের শেষ নয়; এর আরেকটি অংশ আছে। আকাশে যখন মেঘ জমে, সূর্য তখন তার আলো ছড়াতে পারে না। মানব জীবনের চলার পথেও বাধা আসে। তবে বাধাকে বাধা না মনে করে তাকে জয় করে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে মানব জীবনের সার্থকতা প্রকাশ পাবে। মনে রাখতে হবে বিপদ মেঘের মতই ক্ষণস্থায়ী। এক সময় আকাশ মেঘমুক্ত হবেই আর সূর্য তার আলো ছড়াতেই থাকবে। পথচলা হবে আবারো আনন্দময়। এই শক্তির বলেই মানুষ জীবনের এই ক্ষুদ্র সময়ের মাঝেই তার শ্রেষ্ঠত্বের ও ক্ষমতার পরিচয় গড়ে তোলে, মহান সব ব্যক্তি যাঁরা পৃথিবীতে অবিস্মরণীয় হয়েছেন, তাঁদের পৃথক কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই। তাঁরা যোগ্যতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে চিরকালের জন্য মানবসমাজে তাদের নাম রেখে গেছেন। সূর্যাস্তের মতো তারা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও চাঁদের মায়াবী আলোর মতো তা তাঁদেরকে স্মরণীয় করে রেখেছে পৃথিবীর বুকে।

কেন আমি একজন সেনা কর্মকর্তা হবো

তাহসিন নাওয়ার আনিয়া

শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-B, রোল-৩৮৭

শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশে প্রথম নারী বৈমানিক হিসেবে ২০১৭ সালে ৭ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে কঙ্গোর উদ্দেশে রওনা দেন দুজন নারী কর্মকর্তা। ২০১৯ সালে প্রথম নারী লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদবিতে উন্নীত হন চারজন সেনা কর্মকর্তা। এর আগে ২০১৮ সালে মেডিকেল কোরে প্রথম নারী মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পান ডাঃ সুসানে গিতি।

আমার জন্ম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত এক সেনা পরিবারে। আমার বাবা একজন সেনা কর্মকর্তা। বাবার চাকরির সুবাদে সবসময় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় থাকার সুযোগ হয়েছে। আমি যখন প্রথম স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম তখন আমার বয়স চার বছর। আমার প্রথম স্কুল বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। সেটি ছিল মহাখালি ডিওএইচএস এ। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়েই যানজটের সম্মুখীন হতে হতো। অথচ ঢাকা সেনানিবাস হলো অপরূপ সৌন্দর্যের একটি স্থান। ছোট বেলা থেকেই সেনানিবাসটির প্রতি আলাদা ভালোবাসা তৈরি হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই ঢাকা থেকে বাবা বগুড়ায় বদলি হলেন। বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে ভর্তি হলাম। বগুড়া ক্যান্টনমেন্টটিও অনেক সুন্দর ও পরিপাটি করে সাজানো। সেখানে কাটল আমার শৈশব। বন্ধুদের সাথে বিকেলে খেলতে বের হতাম। কখনো বাবা মা বাইরে যেতে বারণ করতেন না। কারণ, ক্যান্টনমেন্টগুলো নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা। বগুড়ায় আমার অনেক বন্ধুবান্ধব হলো। কিন্তু বগুড়া থেকে আমার বাবা আবারো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বদলি হলেন। ঢাকায় শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজে ভর্তি হলাম। সেখানে বিএনসিসি ক্যাডেটের ক্লাসে যোগ দিলাম।

ঢাকা থেকে আবার বাবা সিলেটে বদলি হলেন। প্রথমে আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল। কারণ ঢাকায় আমার প্রিয় বন্ধুদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু যখন সিলেট ক্যান্টনমেন্টে গেলাম, দেখলাম সিলেট বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর। সিলেটে জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ভর্তি হলাম। মূলত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সব ট্রেনিংগুলো এই ক্যান্টনমেন্টেই হয়। কমান্ডো ট্রেনিং, প্যারাজাম্পিং থেকে শুরু করে সব ধরনের ট্রেনিং এই ক্যান্টনমেন্টে হয়ে থাকে। এ সব দেখে আমার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পর্কে জানার আগ্রহ জন্মালো। বাবার কাছ থেকে গল্প শুনে এবং বই পড়ে জানতে পারলাম বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর স্থল শাখা। এটি সশস্ত্র বাহিনীর সর্ববৃহৎ শাখা। সেনাবাহিনীর প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে মূলত দেশের

ভূ-খণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষাসহ সব ধরনের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহায়তায় প্রয়োজনীয় জনবল সরবরাহ করা। প্রাথমিক দায়িত্বের পাশাপাশি যেকোনো জরুরি অবস্থায় বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় এগিয়ে আসতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাংবিধানিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১৯৭১ সালে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করার পর মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা ও সৈন্যদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭২-৭৩ সালের মধ্যেই সেনাবাহিনীতে ইঞ্জিনিয়ার্স, সিগন্যালস সার্ভিস, অর্ডিন্যান্স, মিলিটারি পুলিশ, গবাদিপশু ও পাখি পালন ও খামার এবং মেডিকেল কোর গঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম শর্ট কোর্সের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতেই কমিশন লাভ করে প্রথম শর্ট সার্ভিস কমিশন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শুধু দেশ রক্ষার কাজেই নিয়োজিত নয়। তারা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। ১৯৮৮ সালে প্রথম বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শান্তি রক্ষা মিশনে যায়। সে বছর তাদের ইরাক ও নামিবিয়ায় মোতায়েন করা হয়। সেই থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২৫টি দেশে ৩০টি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নেয়। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে নামিবিয়া, তাজাকিস্তান, সাহারা, সিয়েরালিওন, কঙ্গো, আইভোরি কোস্ট, হাইতি, ইথিওপিয়া, কম্বোডিয়া, সোমালিয়া, সুদান, ইরিত্রিয়া, লাইবেরিয়া ইত্যাদি। এই পর্যন্ত ৮৮ জন সেনা সদস্য শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত অবস্থায় শহিদ হয়েছেন। শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ মান ও অবদান সারাবিশ্বে প্রশংসিত। এর ফলে জাতিসংঘের উচ্চ পদগুলোতে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সদস্যের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নারীদের অগ্রযাত্রা শুরু হয় ২০০০ সালে। পুরুষ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি নারী কর্মকর্তারাও সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছেন। দাপ্তরিক উন্নতি কিংবা সামাজিক-সবখানে সমানভাবে বিচরণ করছে শ্যামল বাংলার দামাল মেয়েরা। শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশে প্রথম নারী বৈমানিক হিসেবে ২০১৭ সালে ৭ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে কঙ্গোর উদ্দেশে রওনা দেন দুজন নারী কর্মকর্তা। ২০১৯ সালে প্রথম নারী লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদবিতে উন্নীত হন চারজন সেনা কর্মকর্তা। এর আগে ২০১৮ সালে মেডিকেল কোরে প্রথম নারী মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পান ডাঃ সুসানে গিতি।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কাজ করার ফলে স্বদেশের প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা বেড়ে যায়। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে নিজের দেশকে রক্ষা করা এবং নিজের দেশের সেবা করার মতো গৌরবের আর কিছু নেই। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কাজ করার মাধ্যমে দেশমাতৃকার সেবা করার ক্ষেত্রটি উন্মোচিত ও প্রসারিত হয়। সেই সেবাব্রত গ্রহণের জন্য আমি একজন সেনা কর্মকর্তা হতে চাই।

আমার প্রতিষ্ঠান আমার গর্ব

আনিকা তাবাস্‌সুম অর্ণা
শ্রেণি-৯ম, শাখা-গ, রোল-৭৬

আজ শুক্রবার বসেছি আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীকে নিয়ে কিছু লিখব বলে। একটি শিশুর শিক্ষাগ্রহণের প্রথম ধাপ পরিবার হলেও এরপর সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

> যখন প্রতিষ্ঠানে যাওয়া-আসার সময় একই স্কুল ড্রেসে, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একত্রে যাতায়াত করতে দেখি, তখন সত্যিই মনে হয় এ যেন এক পরিবার। সিপিএসসিএম পরিবার।

আমি নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর একজন শিক্ষার্থী। আমার নিজ প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে আমার সত্যিই অনেক অনুভূতি রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার রয়েছে একান্ত অনুরাগ ও ভালোবাসা। এর কারণটা অনেক বিস্তৃত। যদি এক কথায় বলতে চাই তাহলে আমাকে প্রাধান্য দিতেই হয় এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবান্ধব পরিবেশকে। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৩ সালে স্কুল শাখা নিয়ে যাত্রা শুরু করে। যার ক্রমধারায় ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠানে কলেজ শাখা খোলা হয়। ময়মনসিংহে আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে আমার মতে, সিপিএসসিএম শ্রেষ্ঠ। প্রতিষ্ঠানের ভেতরের পরিবেশ আমাদেরকে অনায়াসেই প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শেখায়। স্কুলে প্রবেশের পূর্বে নিরাপত্তার জন্য রয়েছে চেকপোস্ট। অভ্যন্তরীণ রাস্তাসমূহে চলাচলের জন্য রয়েছে সুশৃঙ্খল নিয়ম-কানুন। অভ্যন্তরীণ রাস্তাসমূহে দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে স্কুলের সময় রিকশা ঢুকতে দেওয়া হয় না। যার দরুণ সাবলীলভাবে স্কুলে আসা-যাওয়া করতে পারে শিক্ষার্থীরা। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ আমাদের জন্য এক অনন্য আদর্শ। তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি নিজে। গত দশ বছরের পথ পরিক্রমায় আমি তাঁদের অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসা শাসন ও শিক্ষা অনুধাবন করেছি। এখনো মনে পড়ে প্রাথমিক শাখায় পড়াকালীন তাঁরা কতটা স্নেহ করে আমাদের পড়াতেন। মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে ওঠার পরও স্নেহ ও গুরুত্ব সহকারে পাঠদানের চেষ্টা করেন। তার পাশাপাশি ভুল করলে তা সংশোধনের জন্য আমাদের ধৈর্য সহকারে বোঝান। প্রতিষ্ঠানকে আমার মনের মণিকোঠায় সর্বোত্তম স্থানে দাঁড় করানোর কারণগুলোর মাঝে শুধু যে ভুল সংশোধনের প্রক্রিয়া বোঝান তা নয়; পড়াশোনার গুরুত্ব অনুধাবনে তাঁরা স্নেহপূর্ণ যে যুক্তিযুক্ত কারণগুলো তুলে ধরেন, তা শুনলে যে শিক্ষার্থী পড়ায় ফাঁকি দিতে চায়, তার অন্তরাত্মা একবার হলেও তার বিবেককে নাড়া দেবে। বলতে দ্বিধা নেই, যতবার তাঁদের কথা ও বক্তব্য শুনি ততবার আমি শিহরিত হয়ে ওঠি। তাঁদের বলা উপদেশ ও নির্দেশার মাঝে যে এক অদ্ভুত শক্তি থাকে, যা একজন শিক্ষার্থীর মন-মানসিকতা বদলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কথা বলার ভঙ্গিমা আমাদের নিমিষেই বিমোহিত করে, আর তাঁদের পড়ানোর ধরন অনুপ্রাণিত করে তাদের মত হতে। তাঁদের পাঠদানের পদ্ধতি খুবই উন্নতমানের। তাঁদের পাঠদানের সময় যে বিষয়টি আমাকে বিস্মিত করে তা হলো পাঠদানের বিভিন্ন পদ্ধতি। পাঠ্য বিষয়কে আমাদের নিকট সহজ করার জন্য তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। শ্রেণিকক্ষে যখন তাঁরা পাঠাদান করেন তখন মনে হয়, পড়াটি সত্যিই সহজ। সবচেয়ে আনন্দ দেয় যে বিষয়টি, তা হলো তাঁদের পড়ানোর মাঝে সর্বদা একটা অভয় থাকে। বিষয়টা এমন, "যদি তুমি এই বিষয়টি প্রথমবার না পারো, না বুঝো তো ভয় নেই, আমাকে বলবে আমি অবশ্যই বুঝিয়ে দেব।" অর্থাৎ শিক্ষক যদি কোনো কঠিন বিষয় পড়াতে শুরু করেন, তখন মনে ভয় জাগে না কেননা তখন অভয় বাণীটি আমাদের মনে জাগ্রত থাকে। মনে কনফিডেন্স অনুভব করি, মনে তখন এ কথাটি জাগে "ভয় নেই, মন দিয়ে শুনি। যে অংশটা বুঝব না তা স্যার কিংবা ম্যাডাম অবশ্যই আমাদের বুঝিয়ে দিবেন। প্রথমবার না হয় নাই বুঝলাম। দ্বিতীয়বার অবশ্যই বুঝবো, বুঝতে পারবো।" আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিষয়কেও গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিনি এখন আমাদের শারীরিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য সর্বদা প্রতিষ্ঠানে থাকেন। আমাদের অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতে অতিথি বক্তাদের আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। **আমাদের অনুপ্রাণিত করতে যাঁরা অতিথি বক্তা হয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, কাউসেলিং এন্ড এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট বেগম ফজিলাতুন নেসা, 10 Minute School এর প্রতিষ্ঠাতা আয়মান সাদিক। যাঁরা সত্যিই আমাদের জন্য এক একটি অণুপ্রেরণা।** আমাদের প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে রয়েছে বড় বড় তিনটি খেলার মাঠ, আমাদের এই নিজস্ব মাঠে আমাদের হাউজভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রুটিন করে আমাদের রোজ সকালে এই মাঠে সমাবেশ হয়। সমাবেশের পূর্বে দশ মিনিট হালকা ব্যায়াম করানো হয়। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে চারটি বাগান রয়েছে, সারাটি বছর বাগানগুলো ফুলে পূর্ণ থাকে। আসলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভেতরকার পরিবেশ খুবই অসাধারণ। এখানে প্রতিফলিত রৌদ্রকে গরমের উৎস বলে মনে হয় না। তা যেন সূর্যের একফালি সোনালি হাসি। যা গাছ, ঘাস, ফুল ও পাতার ওপর পড়ে তাদের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করছে। তার মাঝে প্রবাহিত হচ্ছে মৃদু-মন্দ বাতাস। আসলে আমাদের নিকট এই প্রতিষ্ঠানটি যেন স্বর্গতুল্য।

প্রতিষ্ঠানে একটি সুসজ্জিত দুই তলা বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম রয়েছে। অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর অর্ন্তগত হলো-একক সংগীত, দলীয় সংগীত, একক নৃত্য, দলীয় নৃত্য, কবিতা-আবৃত্তি অভিনয় ও বির্তক প্রতিযোগিতা। জাতীয় দিবসগুলো আমরা অডিটোরিয়ামে পালন করে থাকি। প্রতিষ্ঠানে একটি শহিদ মিনার আছে। আমরা শহিদ মিনারে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারিতে ফুল দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য প্রতিষ্ঠানে দুটি কোস্টার আছে, যার মাধ্যমে আমরা শিক্ষাসফর করি।

আমরা সকলেই জানি একটি প্রতিষ্ঠান তখনি পূর্ণতা পায়, যখন তার একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি থাকে। আমাদের প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরি আছে। লাইব্রেরিতে বড়ো বড়ো ৮-১০টি আলমারির ভেতর নানা রকম বই আছে। আইডি কার্ডের মাধ্যমে ডিজিটাল সিস্টেমে আমাদের বই দেয়া ও নেয়ার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। বলাবাহুল্য এই লাইব্রেরি হলো আমার স্বপ্নের জায়গা। এই লাইব্রেরির বই পড়েই আমি বই পড়ার আনন্দ অনুভব করি। আর আমার বিশ্বাস, আমার মতো আরো অনেকেরই বই পড়ার হাতে-খড়ি এই লাইব্রেরি থেকে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন ও মেধার বিকাশের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ফ্লোরে মনীষীদের জীবনী ফ্রেমবন্দি করে টাঙানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিচিত্র বিষয়ে লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় বার্ষিক ম্যাগাজিন।

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ সর্বদাই আমাদের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তার যুক্তিযুক্ত প্রমাণ এই দুঃসময়ে আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা। এখন করোনাকাল। বিশ্বের চারদিকের মতো আমাদের দেশে অনেকেই মৃত্যুর মিছিলে যুক্ত হয়েছে কেউবা করোনায় আক্রান্ত। এর মাঝেও আমাদের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ আমাদের কথা চিন্তা করছেন। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে আমাদের ক্লাস নিচ্ছেন ও খোঁজ-খবর নিচ্ছেন যাতে আমাদের পড়াশোনার ক্ষতি না হয়। আমার বাবা এই প্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখার একজন শিক্ষক। আমরা সিপিএসসিএম টিচার্স কোয়ার্টারে থাকি। সত্যিই এই স্থানটি স্বর্গতুল্য। সব-সময় প্রত্যেকটি রুম আলোয় পরিপূর্ণ থাকে। যে বাতাস প্রবাহিত হয় তা খুবই নির্মল এবং জীবাণুমুক্ত। জানালা দিয়ে চোখ গেলেই দেখা যায় বিস্তীর্ণ মাঠ যা রোদে ঝলমল করছে কিংবা সজীবতা ফুটিয়ে তুলছে। "আহা..... এই আলো-বাতাসে বসবাস করলে যে কেউ নিজেকে স্বর্গবাসী ভাববে।" এই প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ একজন শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের জন্য যথেষ্ট।

যখন প্রতিষ্ঠানে যাওয়া-আসার সময় একই স্কুল ড্রেসে, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একত্রে যাতায়াত করতে দেখি, তখন সত্যিই মনে হয় এ যেন এক পরিবার। সিপিএসসিএম পরিবার। জানি না, ময়মনসিংহের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্য। তবে এতটা সুচারুরূপে প্রতিটি বিষয় ভেবে কার্যক্রম পরিচালনা হয়তো শুধু আমার এই সিপিএসসিএম প্রতিষ্ঠানেই হয়। যা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিয়ার গ্রিলস

মোজাহিদুল ইসলাম রিফাত
শ্রেণি-সপ্তম, শাখা-খ, রোল-২৩৫

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা তাদের নিজেদের নাম পৃথিবীর বুকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছেন। যাঁরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে নানা জায়গায় লড়াই করেছেন। পৃথিবীর রেকর্ড ভেঙে বিজয়ী হয়েছেন, এমন এক সাহসী সার্ভাইবার "এডওয়ার্ড মাইকেল বিয়ার গ্রিলস"। যে ব্যক্তি যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে বিশ্বের মাঝে রেকর্ডার হয়েছেন।

গ্রিলস এর জন্ম ৭ জুন, ১৯৭৪ সালে। তিনি একজন ব্রিটিশ অভিযাত্রী, লেখক এবং টেলিভিশন উপস্থাপক। তাঁর একজন বড় বোন ছিল, তাঁর নাম 'লারা ফাউসেট'। লারা পেশায় একজন টেনিস কোচ। লারা বিয়ার গ্রিলসের 'বিয়ার' নামটি দেন, যখন তার বয়স ছিল কেবল এক সপ্তাহ।

বিদ্যালয় জীবন শেষ হওয়ার পর তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে মনস্থ করেন। ১৯৯৬ সালে জাম্বিয়ায় গ্রিলস একটি প্যারাসুট দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। এ সময় গ্রিলসের চিরতরে হাঁটার ক্ষমতা বন্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং তাঁর শৈশবের লালিত স্বপ্ন "মাউন্ট এভারেস্ট" জয়ের নেশায় উদ্বেলিত হন। তারপর ২৩ বছর বয়সে তিনি 'গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এ সর্বকনিষ্ঠ ব্রিটিশ হিসেবে এভারেস্ট জয়ের রেকর্ড করেন। তাঁর প্যারাসুট দুর্ঘটনার আঠারো মাস পরেই তিনি এভারেস্ট আরোহণ করেন। তবে জেমস অ্যালেন নামক একজন অস্ট্রেলীয় নাগরিক ২২ বছর বয়সে একটি দলের সাথে এভারেস্ট জয় করেন। আর সে সময়ে ১৯ বছর বয়সে এক ব্রিটিশ তরুণ এভারেস্ট জয় করে গ্রিলসের রেকর্ড ভেঙে ফেলেন।

২০০৫ সালে বিয়ার গ্রিলস এবং তাঁর এগারো সহযোগীর ফ্রেঞ্চ ফরেন লিজিওনের আওতায় সাহারা মরুভূমিতে প্রশিক্ষণের ওপর 'এস্কেপ টু দ্য লিজিওন' নামে একটি টেলিভিশন শো নির্মিত হয়। এভাবে বিয়ার তাঁর খ্যাতি সারা বিশ্বে পৌঁছে দেন। বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা করতে হয়, তা সাধারণ মানুষকে টেলিভিশনে দেখাতেন। এটি সর্বাধিক জনপ্রিয় টেলিভিশন প্রোগ্রামে পরিণত হয়। বিশ্বজুড়ে ৯.২ বিলিয়ন মানুষ এই অনুষ্ঠানটি দেখে থাকে।

এই অনুষ্ঠানে দেখা যায়, বিয়ার গ্রিলস সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করেছে, হেলিকপ্টার থেকে প্যারাসুট নিয়ে নামছেন, প্যারাগ্লাইডিং করছেন, বরফ আবৃত পাহাড়ে উঠছেন, গভীর অরণ্যে, আগুনের মধ্য দিয়ে দৌড়াচ্ছেন, সাপ, পোকা-মাকড় কীট-পতঙ্গ খাচ্ছেন। এভাবে নানা প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার টিপসগুলো টেলিভিশনে প্রদর্শন করেন। তিনি দেখান কীভাবে সাগর পাড়ি দেওয়া যায়, কী দিয়ে কোন জিনিস বানাতে হয়, কীভাবে আগুন ধরাতে হয়, কীভাবে প্রাণী শিকার করতে হয়। এরকম নানা ধরনের প্রশিক্ষণ বিয়ার দেন। বর্তমানে "Discovery" চ্যানেলে প্রায়ই বিয়ারকে দেখা যায়। এই চ্যানেলের সামনে শত শত মানুষ বসে থাকে তাঁর সার্ভাই দেখার জন্য। বিয়ারের সাথে সব সময় একটি ছুরি থাকে, কারণ এই ছুরিই তার সকল কাজের সহায়ক এবং তাঁর সাথে থাকে ক্যামেরাম্যান, বিয়ার যা করছেন তা সকল কিছু ক্যামেরাম্যান ধারণ করেন। প্রতিকূল পরিবেশ থেকে অনুকূল পরিবেশে যাওয়ার জন্য বিয়ার যখন অনেক ধরনের কাঠামো তৈরি করেন, তার মধ্যে অনেকগুলোই একাধিকবারে সফল হন। মাঝে মাঝে সাধারণ ভুলের জন্য সুউচ্চ কোনো স্থানে বিয়ার ঝুলে থাকেন। সেখান থেকে তিনি সার্ভাইব হন, এটিও আমাদের শেখায় যে, কীভাবে ঝুলন্ত অবস্থা হতে ফিরে আসা যায়। তার সাহসী কীর্তি আমাদের মতো মানুষদের কাছে সত্যিই এক অসাধারণ কল্পনা ও বিস্ময়!

বর্তমানে বিয়ার কিছু সঙ্গীদের নিয়ে যায় তার সাথে, যেন তারা যেকোনো অবস্থায় প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে। তার সাথে বিভিন্ন পরিবেশে থাকার চেষ্টা করলেও অনেকেই নিজের হাল ছেড়ে দেন। কারণ তখন তারা হয়তো ভাবে এইসব পোকা মাকড় খাওয়ার চেয়ে এখানে আসাটাই তাদের সবচেয়ে বড় ভুল। আসলে তা নয়, প্রতিকূলে কীভাবে টিকে থাকতে হয়, তার জন্য এই খাদ্য। এভাবে বিয়ারের সাথে অনেকে টিকে থাকতে পেরেছেন শেষ পর্যন্ত।

সত্যিকার অর্থে বিয়ার তার জীবনের সবটুকুই বাজি রেখেছেন নিজের কর্মপ্রচেষ্টায়। ভীতিতেও তিনি হাল ছেড়ে দেননি। অন্ধকারকে তিনি আলোকিত করেছেন। বিয়ার গ্রিলসের জীবনকাহিনী এক অনন্য বিস্ময়। তার কর্মপ্রচেষ্টায় তিনি সকল ক্ষেত্রেই জয়ী হয়েছেন। বিয়ার গ্রিলসের সার্ভাইব আমাদের মনকে প্রফুল্ল করে তোলে। তাই বলা যায়, তার সাফল্য পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে।

শিক্ষা সফর-২০২০

রোহিত সেন
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-E, রোল-৪১১

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যেমন আমাদের বাস্তব জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে তেমনি, সহপাঠ্যক্রমে শিক্ষা আমাদের সে জ্ঞান অর্জনের পথকে করে আনন্দিত। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের জন্য সহপাঠ্যক্রম কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আয়োজন করে শিক্ষা সফরের। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অধ্যক্ষ মহোদয় যখন শিক্ষা সফরের সময় ও স্থান ঘোষণা করলেন, সাথে সাথে আমাদের ভেতরে এক অজানাকে জানার আগ্রহ তৈরি হল। রবিঠাকুর যথার্থই বলেছেন, ''মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করবে প্রকৃতি থেকে, শুধু প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট গণ্ডি থেকে নয়।'' বিশ্রাম কাজের অঙ্গ একসাথে গাঁথা; নয়নের অংশ নয়নেরই পাতা, ঠিক শিক্ষাসফরও শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বাংলাদেশের প্রথিতযশা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী অন্যতম। প্রতিষ্ঠানটি প্রাতিষ্ঠানিক পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করার জন্য প্রতিবছরই শিক্ষাসফরের আয়োজন করে থাকে। প্রতিবছরের মতো এবছরও ফ্যান্টাসি কিংডম, জামগোরা-আশুলিয়ায় একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসফর অনুষ্ঠিত হয়।

ফেব্রুয়ারি মাসের শীতের শিশির ভেজা কোমল রৌদ্রোজ্জ্বল একটি দিন। এরকম একটি সুন্দর দিনে আমরা সবাই কলেজ ক্যাম্পাসে উপস্থিত হলাম। সেখানে থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হলো, এরপর আমরা সকাল ৮টায় নির্দিষ্ট বাসে ওঠে ৮ টা ১৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের বাসের দায়িত্বে দুইজন শিক্ষক ছিলেন নাছির উদ্দিন স্যার এবং সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু স্যার। দুইজনই বাসে বেশ মজা করেছেন। যাত্রা পথে আমাদের নাস্তা দেয়া হয়। নাস্তা শেষে সকলে গান, নাচ, গল্পে মেতে উঠলাম। হাসি-মজার ছলে আমরা ১১.৩০ মিনিটে ফ্যান্টাসি কিংডমে পৌঁছলাম, স্যারদের তত্ত্বাবধানে বাস থেকে সবাই নামলাম। এরপর আমরা সবাই ফ্যান্টাসি কিংডমে প্রবেশ করলাম। সেখানকার সকল মজা ও বিনোদনের ব্যবস্থাগুলো যেমন, রোলারকোস্টার, বামপারকার, কেটাপিলার, স্লাইড ইত্যাদি রাইডগুলো উপভোগ করলাম।

এরপর আমরা সকলে ওয়াটারকিংডমে প্রবেশ করলাম সেখানে সুইমিংপুল ও বিভিন্ন মজার ওয়াটাররাইডগুলো উপভোগ করলাম। ২.৩০ মিনিটে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হলো। খাওয়া শেষে আমাদের আনন্দ ও বিনোদনের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাচ-গান-কৌতুক পর্ব এলো। আমরা আনন্দ ও উল্লাসের সাথে উপভোগ করলাম। দিনশেষে এল ফেরার পালা।

আমাদের কারোরই ফিরতে মন চাইছিল না, কিন্তু তখন মনে পড়ে গেল একটি গান- ''সময় হয়েছে ফিরে যাবার, মন কেন যেতে চায় না বলো না...।'' সকলে আবার নির্দিষ্ট বাসে উঠে পড়লাম, এর পর আবার নাচ-গান-গল্প ও আনন্দ করতে করতে সবাই ফিরে এলাম।

শিক্ষাসফরের আনন্দ-অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শিক্ষা সফর যেমন আনন্দ দেয়, ঠিক তেমনই পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটায়। এই দিনটি কোনো দিনই ভুলতে পারব না।

ক্রীড়াঙ্গনে সিপিএসসিএম

স্মরণ সরকার

শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-A, রোল-৩৭

স্বাস্থ্য গঠনের জন্য শরীর চর্চা যেমন প্রয়োজন, তেমনি সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য মনের আনন্দও সমানভাবে প্রয়োজন। খেলাধুলা এমন একটি মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে দেহের সুস্থতা ও মনের আনন্দ দুটিই লাভ করা যায়। প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিদ্যা অর্জন যেমন প্রধান লক্ষ্য, তেমনি আনন্দ উপভোগের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিপিএসসিএম সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে শুরু থেকে। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনীর মাধ্যমে সিপিএসসিএম এর ২৭তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২০ শুরু হয়। তিনটি হাউসে বিভক্ত হয়ে স্কুল ও কলেজ শাখার শিক্ষার্থীদের ৮টি গ্রুপে ভাগ করে ৭২টি ইভেন্ট নিয়ে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। উদ্বোধন করেন তৎকালীন অধ্যক্ষ মহোদয়। তিনদিন ব্যাপী তুমুল উত্তেজনাপূর্ণ এই প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ পয়েন্ট নিয়ে জয়নুল হাউস চ্যাম্পিয়ন ও ঈশা খাঁ হাউস প্রথম রানার আপ ও নজরুল হাউস দ্বিতীয় রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ প্রধান অতিথি হিসেবে ১৯ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও এরিয়া কমান্ডার, ঘাটাইল এরিয়া, মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান শামীম, বিপি, এনডিসি, পিএসসি মহোদয় উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

আন্তঃহাউস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯-২০২০

২০১৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃহাউস আউটডোর গেমস। উক্ত প্রতিযোগিতায় নজরুল হাউস ফুটবল, ক্রিকেট ও ভলিবল চ্যাম্পিয়ন, জয়নুল হাউস বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন এবং ঈশা খাঁ হাউস হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয় চিফ প্যাট্রন আন্তঃহাউস প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতা। উক্ত খেলায় উপস্থিত থেকে বিজয়ীদল নজরুল হাউসকে পুরস্কৃত করেন পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মহোদয়।

আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৮

আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় (ঘাটাইল অঞ্চল) ৮টি ক্যান্টনমেন্টের অংশগ্রহণে ফুটবল (বালক) ও হ্যান্ডবল (বালিকা) এর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিপিএসসিএম বালক ফুটবল দল (কলেজ) এবং বালিকা হ্যান্ডবল দল (স্কুল) চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এতে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়।

আন্তঃ স্কুল ও কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯-২০২০

২০১৯ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় স্কুল মাদরাসা ক্রীড়া সমিতি কর্তৃক আয়োজিত ৪৮তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। উক্ত প্রতিযোগিতায় সিপিএসসিএম হ্যান্ডবল (বালক) ও বাস্কেট বল (বালক) দল জেলা পর্যায়ে রানার আপ ও বালিকা হ্যান্ডবল দল আঞ্চলিক পর্যায়ে রানার আপ এবং বালিকা টেবিল টেনিস জাতীয় পর্যায় খেলার গৌরব অর্জন করে।

আন্তঃ কলেজ প্রতিযোগিতায় সিপিএসসিএম-এর শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান শাওন জেলা পর্যায়ে চাকতি নিক্ষেপ ও বর্শা নিক্ষেপে ১ম স্থান অর্জন করে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে চাকতি নিক্ষেপে ১ম স্থান এবং বর্শা নিক্ষেপে ২য় স্থান লাভ করে।

বাংলাদেশ যুব গেমস-২০১৮

৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ থেকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ যুব গেমস। বাংলাদেশ যুব গেমসে সিপিএসসিএম এর বালক ও বালিকা দল ময়মনসিংহ বিভাগ থেকে অংশ গ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে খেলার গৌরব অর্জন করে এবং ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থী স্মরণ সরকার ও সাদাত আল হাবিব সৌরভ স্কোয়াশে অংশগ্রহণ করে ৪র্থ স্থান লাভ করে। জয় হোক ক্রীড়ার। জয় হোক সিপিএসসিএম এর নবীন ক্রীড়াবিদদের।

মালয়েশিয়া ভ্রমণ

নওরীন আহমেদ
শ্রেণি-৫ম, শাখা-ক, রোল-৫৫

কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'সংকল্প' কবিতার মত আমারও স্বপ্ন পৃথিবীটা ঘুরে দেখার। সেই স্বপ্ন বাস্তব করার সুযোগ করে দেয় বাংলাদেশ গার্লস গাইড এসোসিয়েশন। আমি মুক্তদল 'নিরমল' এর একজন দীক্ষাপ্রাপ্ত হলদে পাখি। আন্তর্জাতিকভাবে হলদে পাখিদের 'ব্রাউনিজ' বলা হয়। গার্লস গাইডিং এর এটি প্রথম স্তর যাদের বয়স ০৬-১০ বছর।

গত এপ্রিল ২০১৯ এ জানতে পারি মালয়েশিয়াতে International Brownies Camp-2019' অনুষ্ঠিত হবে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের সহযোগিতায় আমার স্কুলের অনুমতিক্রমে সেখানে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করে আমি মনোনীত হই। সারা বাংলাদেশের দশটি অঞ্চল থেকে মোট ১৩ জন হলদে পাখি ও ৪ জন বিজ্ঞপাখি (যারা হলদে পাখিদের পরিচালনা করেন এমন শিক্ষিকা) কে মনোনীত করে একটি টিম গঠন করা হয় এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করার জন্য। এই মনোনয়ন আমার স্বপ্ন পূরণের দুয়ার খুলে দেয়।

ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় মালয়েশিয়ার বানটিং এর সেলানগড়ে 'জুগ্‌রা লেক ভিউতে' ২৯ আগস্ট থেকে ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। অংশ নেয় মালয়েশিয়ার ১৫টি শাখাসহ এশিয়া প্যাসিফিকের ৫টি সদস্য সংগঠন যথা-হংকং, ব্রুনেই, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশ।

ভিসা জটিলতায় টেনশন নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। একদম শেষ মুহূর্তে ২৭ আগস্ট ২০১৯ ভিসা পেলাম। তৎক্ষণাৎ প্লেনের টিকিট কনফার্ম করা হল থাই এয়ারওয়েজে। এটা আমার জীবনে প্রথম প্লেনে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা।

২৮ আগস্ট ভোর ৪.৪০ মিনিটে যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনে রওনা হয়ে সকাল ৯.০০ টায় সরাসরি বেইলি রোডে 'গাইড হাউস' এ এসে পৌঁছলাম। বেলা দুইটায় আমাদেরকে ব্রিফিং করা হল। এখানে টিমের সবার সাথে পরিচিত হলাম। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সবাই বন্ধু হয়ে গেলাম। ব্রিফিংএ আমাদের জানিয়ে দেয়া হয় আমরা ক্যাম্পে কে কোন দলে পড়েছি। সেখানে আমরা কী কী করব, কী কী করব না। প্রথম বিদেশ যাচ্ছি পরিবার ছেড়ে। আমরা যেন দেশের সম্মান রক্ষা করতে পারি-মনে মনে এই সংকল্পবদ্ধ হলাম।

ক্যাম্পে আটটি বড় দল থাকবে। দলগুলো হল ডোরা, পাওয়ারপাফ গার্ল, ভেনোলপি, লিলো, ভায়োলেট, এগনেস, মোয়ানা এবং কিমপসিবল। প্রতি দলে একজন করে বিগ সিস্টার থাকবেন। আমি পড়েছি ভেনোলপি-৪ দলে। আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম- বাংলাদেশের জন্য আমরা অনেক সুনাম বয়ে আনবো।

আমাদের ফ্লাইট রাত দুইটায়। সন্ধ্যা সাতটায় পুরো টিম একটি গাড়িতে করে পৌঁছে গেলাম হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। এখানে আমি আগেও এসেছি। কিন্তু সেটা কাউকে রিসিভ করতে কিংবা কাউকে বিদায় জানাতে। এবার আমি নিজেই বিমানবন্দর পেরিয়ে যাব এক

অজানা-অচেনা দেশে। বিমানবন্দরে পৌঁছে আমি যেন অন্য জগতে চলে গেলাম। ভেতরে ঢোকার পর-উহ, এ কোন আলোর রাজ্যে এসে পৌঁছলাম। কী যে সুন্দর চারিদিক!

আম্মু আমাকে বিদায় জানাতে বিমান বন্দরে এসেছেন। ইমিগ্রেশনে বিশাল লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা, কাঁধ আর পিঠ ব্যথা হয়ে গেল। আমি আম্মুর কাছে কফি খেতে চাইলাম। আম্মু ২০ টাকার কফি ২০০ টাকায় কিনে আনলেন। এয়ারপোর্টের ভেতরে জিনিসের দাম খুব বেশি। গরম কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে আমি জিহ্বা পুড়ে ফেললাম।

এরই মধ্যে আমার পাসপোর্ট চেকিং আর লাগেজে টিকিট লাগানোর পালা শেষ করে লাগেজ জমা দিয়ে আমরা মেইন ইমিগ্রেশনে বোর্ডিং পাসের জন্য আম্মুর কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে রওনা দিলাম। প্লেনের দরজার দুইপাশে দুইজন মেয়ে এয়ারহোস্ট দাঁড়ানো। তারা টিকিট চেক করে নিজেরাই আমাদের সিট দেখিয়ে দিলেন। তারা যে কত অমায়িক! প্রথম প্লেন ভ্রমণ হিসেবে খুবই উত্তেজিত ছিলাম। আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমার সিট হবে জানালার পাশে। কী অবাক কাণ্ড! আমার সিট সত্যিই জানালার পাশে। প্লেন যখন উড়ল প্লেনের জানালা দিয়ে রাতে আলোকিত ঢাকা শহরকে দেখলাম। কী বিশাল শহর! আর কত্ত সুন্দর!

ভোর ছয়টায় থাইল্যান্ডের ব্যাংককে 'সুবর্ণভূমি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট' এ আমাদের প্লেন ল্যান্ড করল। ঝকঝকে সকাল। ভীষণ সুন্দর এয়ারপোর্ট। এখানে আমাদের তিন ঘণ্টার বিরতি। আমরা কিছু ছবি তুললাম। এখানে একটি সোনালি রঙের বৌদ্ধ মূর্তি আছে। আমার পাশে বসেছিল কানাডা থেকে আসা এঞ্জেলিনা। ওর জন্ম কুয়ালালামপুরে। বহুদিন পর দেশে যাচ্ছে। আমরা একই প্লেনে কুয়ালালামপুর যাব। এই এয়ারপোর্টে নিউজিল্যান্ডের লোকদের সাথেও দেখা হয়েছে। তারা সারা বিশ্ব ঘুরতে বেড়িয়েছে। ইনশাল্লাহ, একদিন আমিও ঘুরব।

সকাল ৯.০০ টায় আমরা আবার প্লেনে ওঠলাম। প্রায় চারঘণ্টা পর আমরা কুয়ালালামপুর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। কী যে সুন্দর সে এয়ারপোর্ট! প্রথ মবার দেখলে অবশ্য মনে হতে পারে এটা এয়ারপোর্ট নয়, যেন শপিং মল।

যে আমাদের রিসিভ করবে, তাকে বেশ খোঁজাখুঁজি করতে হল। অবশেষে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল। এ সময় আমরা হংকং ও মালদ্বীপ থেকে আসা দলের দেখা পেলাম। মালদ্বীপের দলের সবাই ওদের বাস পেয়ে চলে গেল। আমাদের আর হংকং এর বাস লেট করল। এই ফাঁকে আমরা হংকং এর মেয়েদের সাথে পরিচিত হলাম। কথা বলতে গিয়ে দেখি এ যেন আমার স্কুলের বন্ধবী লাবিবা। আমি মনে মনে ভাবছি লাবিবা এখানে! তাও হংকং এর টিমে! কী করে? তাই ওকে জিজ্ঞেস করলাম ওর নাম কী? ও বলল ওর নাম জেভিসভিয়া। ওদেরকে আমরা বাংলা শেখাতে চেষ্টা করলাম। আমরা বাংলায় যা বলছিলাম তা আবার ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে দিচ্ছিলাম। আমাদের দলের স্নেহা ওকে জিজ্ঞেস করল-জেভিসভিয়া, তোমার নাম কী? ও তখন বলল, ওহ। ইউ নো মাই নেম। আই এম জেভিসভিয়া।

জুগরা লেক ভিউতে পৌঁছলাম বিকেলবেলা। জায়গাটা খুব সুন্দর। রেজিস্ট্রেশন শেষ করে দুপুরের খাবার খেলাম। খাবারটা ছিল এক ধরনের নুডুলস যা অলিভ অয়েল দিয়ে

রান্না করা। এর মধ্যে আবার নারকেল আর চিকেন মেশানো ছিল। তবে তেমন মজাদার নয়।

বিশাল বড় একটা রুমে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওপেন হলরুমে আমাদের স্বাগত জানিয়ে ব্রিফিং করা হল। এরপর আমরা টিম থেকে গ্রুপে ভাগ হয়ে গেলাম।

আমি পরেছিলাম ভেনোলপি-৪ গ্রুপে। আমাদের গ্রুপের বিগসিস্টার ছিলেন শ্রীলংকান ম্যাম অপ্সরা কুমারেজ (Apsara Kumarage)। রাতে ওপেনিং সেরিমনিতে ক্যাম্পের উদ্বোধন হল। মঞ্চে যখন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছিল তখন আনন্দে আমার মন ভরে যাচ্ছিল। আমরা নাচ পরিবেশন করলাম। অন্যান্য দেশও তাদের নাচ পরিবেশন করল। রাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছি আম্মু আর আপুকে ছাড়া, একা।

ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিন খুব ভোরে একাই ঘুম থেকে উঠেছি। আজ আম্মু মোবাইলে ডাকেনি। তারপর ফ্রেশ হয়ে ড্রেসআপ করে নাস্তা সেরে ক্যাম্পের সব টাস্ক (জঙ্গল হান্টিং, হাইকিং সহ) শেষ করেছি। জঙ্গল হান্টিং আমাদের বলা হয়েছিল হাতের কাছে যা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে আমাদের জঙ্গল প্রিন্সেস সাজতে হবে। আমি গাছের পাতা, বাকল, শিকড় এসব দিয়ে মাথার ক্রাউন বানালাম। বিকেল ৩.০০ টায় আমরা 'মাহ-মারি' কালচারাল ভিলেজ (Mah-Mari Cultural Village) এ তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানলাম ও খুব সুন্দর মিউজিয়াম দেখলাম। তারপর গেলাম Palm Oil Experience Center এ। ফিরে এসে ড্রেস চেঞ্জ করে গোসল সেরে এলিয়েন নাইটের জন্য প্রস্তুতি নিলাম। এলিয়েন নাইটে গান ও নাচ চলছিল।

ক্যাম্পের তৃতীয় দিন ওপেন হলরুমে দেশভিত্তিক স্টল সাজানো হলো। আমি ফ্রেন্ডশিপ ব্যাজ, পুতুল, আমাদের দেশের পতাকা সিম্বলের চাবির রিং আর কয়েন নিয়ে গিয়েছিলাম। সেগুলো আমি বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বন্ধুদেরকে গিফট করেছি। আমিও বিভিন্ন দেশের বন্ধুদের কাছ থেকে অনেকগুলো স্টিকার ও ব্যাজ গিফট পেলাম। রাতে মারদেকা নাইটে অনেক সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। এই অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার রানি এসেছিলেন। এটা আমাদের ক্লোজিং সিরিমনিও ছিল। আমরা আমাদের সনদ পেয়েছি এই অনুষ্ঠান শেষে। এই রাতেই ক্যাম্প ফায়ার হল। আমরা গান গাইলাম, যা সবাইকে মাতিয়ে তুলেছিল। আমরা সবাই সেদিন খুব মজা করেছি। রাতে অবশ্য আমার সামান্য জ্বর এসে ছিল।

সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ জ্বর নিয়েই মালয়েশিয়ার সংসদ ভবনে এবং পুত্রজায়া দেখতে যাই। মালয়েশিয়ান লোকজনদের দেখলাম সকলেই পরিধান করেছে সাদা জামা। বিশেষ করে মেয়েদের কোমর পর্যন্ত শার্ট সাদা। নিচে অবশ্য জিন্সের থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট। আবার কেউ কেউ সাদা ফ্রকও পরেছে ।

আমাদের ফেরার প্লেন রাত ৮.৫৫ মিনিটে ছাড়ে। আমার পাশে বসেছিল একটা থাই ছেলে নাম জেসন। তার সাথে বেশ কথা হল। তারপর একসময় ঘুমিয়ে যাই। ঘুম থেকে যখন জেগে উঠি তখন রাত ১০.৩৩ বাজে, প্লেনে তখন আমরা থাইল্যান্ড এয়ারপোর্টে। প্রায় একঘণ্টা যাত্রাবিরতির পর আবার রাত ১১.৩০ মিনিটে প্লেন উড়ল।

রাত ১.০০ টায় নিজ দেশের মাটিতে পা রাখলাম। বিমান থেকে নামার আগ পর্যন্ত ঠিক ছিলাম। নামার পর, **এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে যখন ইমিগ্রেশন করতে যাব তখনই নীরবে দুচোখে ঝরঝর পানি, আমি কাঁদছি। আজ স্বদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করতে পারলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন অঝরে কেঁদেছিলেন। আমি আমার দেশকে, আমার মাকে খুব ভালোবাসি।** আম্মু অপেক্ষায় ছিল গ্লাসের ওপাশে। দেখে মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। ইমিগ্রেশন শেষ করে লাগেজ বুঝে নিয়ে আম্মুকে জড়িয়ে ধরলাম।

দেশে ফিরে একটু সুস্থ হয়ে গাইড হাউজ ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের সবার সাথে দেখা করি। তারপর স্কুলে যাই। দেখা করলাম আমার শ্রেণিশিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক স্যারের সাথে। সর্বশেষে দেখা করলাম প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে। স্যার অনুমতি না দিলে আমি এ ভ্রমণের সুযোগটি কিছুতেই নিতে পারতাম না। আর আম্মুর বান্ধবী উম্মে আফসারি জহুরা (মুকুল আনটি) শেষ মুহূর্তে এগিয়ে না এলে হয়ত ভিসাই পেতাম না। সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

৭১ এর অসমাপ্ত গল্প

মঞ্জুর আহমেদ
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-C, রোল-১৪০

চা খেতে খেতে হাতে থাকা মোবাইলটির দিকে নজর গেল আমার, ক্যালেন্ডারের তারিখটা বের হয়ে আছে। আজ ১৮ অক্টোবর মানে একটা বিশেষ দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে আমার দুই বন্ধু লাফিজ আর নাহিদ শহিদ হয়েছিল। আবার এই দিনেই দুজনের একজনের জন্মদিন ছিল। এসব ভাবতে ভাবতে চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল হাতে থাকা মোবাইলটার স্ক্রিনে। এখনও সেই নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের কথা মনে পড়লে বুকের বা'পাশটা চিন চিন ব্যথা করে। আজ আমার বয়স ৬৭ বছর। ঠিক ৪৯ বছর আগে হয়ত আমার বুকে এমন ব্যথা হয়নি। কারণ তখন আমার পাশে আমার প্রিয় দুই বন্ধু ছিল। হয়ত আমি যুদ্ধে না গেলে তারা আজ বেঁচে থাকত। কিন্তু সব কিছু যে আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। আমার যুদ্ধে যাওয়াটাও এক ধরনের নাটকীয়তা। আমার বন্ধুরা না থাকলে হয়ত আমি যুদ্ধে যেতাম না। আমি আমার জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসতাম আমার একমাত্র সম্বল আমার প্রিয় মাকে। তিনি অনেক আগেই মারা গেছেন। তাই মায়ের শেষ সম্বল আমিই ছিলাম। সব মিলিয়ে ভালোই চলছিল আমার জীবন। হঠাৎ একদিন আমার বন্ধু নাহিদ বলল-"২৫ তারিখ রাত্রে ঢাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পাখির মত মানুষকে হত্যা করেছে।"

"কিন্তু মা, সেই শেষ আশা যে হুমকির মুখে। তারা যে আমার দেশকে কেড়ে নিতে চায়" কান্না করতে করতে মাকে বললাম। মা বললেন, "তাহলে তুই যুদ্ধে যা, জানোয়ারদের মেরে তবে ফিরবি। কিন্তু আমাকে কথা দে, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আমার হাতে দুধ-ভাত খাবি এবং আমার জন্য দেশের একটা পতাকা আনবি।"

লাফিজ বলল- "রেডিও-তে আমিও তাই শুনলাম।"

আমি বললাম- "তার মানে দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে আর যুদ্ধ মানেই রক্ত, খুনাখুনি, মারামারি আর কাটাকাটি।"

লাফিজ বলল- "আরে, বঙ্গবন্ধু তো সেই ৭ই মার্চ যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে বলেছিলেন।"

নাহিদ বলল- "তাহলে কি আমরা দেশের জন্য যুদ্ধ করে দেশের ঋণ শোধ করতে পারি?"

আমি বললাম- "আমি যুদ্ধে গেলে আমার বৃদ্ধ মায়ের কী হবে? আমার মা খাবে কী?"

লাফিজ বলল- "তোর দেশ মা মরলে তোর কী হবে? এই কথা কি কখনো ভেবেছিস?"

"তাহলে মাকে আগে রাজি করাতে হবে।"

নাহিদ বলল- "তাহলে আগামী মঙ্গলবার মোস্তফা ভাইকে বলে আমরা যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করব।"

বন্ধুদের সাথে কথা বলার পর আমি বাড়ি আসি। মাকে যুদ্ধের কথা বলার সাহস আমার নেই। তাই বুদ্ধি করে মাকে বললাম, "মা তুমি আমাকে কতটুকু ভালোবাস?" মা বললেন, "হঠাৎ এই কথা কেন বাবা! তুই ই তো আমর শেষ আশা।"

"কিন্তু মা, সেই শেষ আশা যে হুমকির মুখে। তারা যে আমার দেশকে কেড়ে নিতে চায়" কান্না করতে করতে মাকে বললাম। মা বললেন, "তাহলে তুই যুদ্ধে যা, জানোয়ারদের মেরে তবে ফিরবি। কিন্তু আমাকে কথা দে, যুদ্ধে থেকে ফিরে এসে আমার হাতে দুধ-ভাত খাবি এবং আমার জন্য দেশের একটা পতাকা আনবি।"

আমি মাকে কথা দিলাম। মঙ্গলবার থেকে টানা ১৫ দিন ট্রেনিং গ্রহণ করলাম। এই ১৫ দিনে হয়ত আমরা একবেলাও পেট ভরে খাবার খাই নাই। ট্রেনিং শেষ হলে আমাদের অপারেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের তিনটা রাইফেল ও ২টা গ্রেনেড দিয়ে বলল, 'মোবারকপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়' হানাদার বাহিনী মুক্ত করার জন্য। আমরা পরিকল্পনা করি কেমন করে আক্রমণ করলে সবচেয়ে ভালো হবে। পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করি এবং একদিনেরও কম সময়ে সম্পূর্ণ

বিদ্যালয় পাকবাহিনী মুক্ত করি এবং পাকিস্তানি আর্মিদের হত্যা করি। আমাদের কাজে মোস্তফা ভাই অনেক খুশি হন এবং পরবর্তী মিশন সম্পর্কে বলেন। আমাদের তিন জনের সঙ্গে আরো ৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা দেয়া হলো। ১৮ অক্টোবর, রাত ১.৩০ মিনিট। আমরা আলমডাঙ্গা পাকক্যাম্পে আক্রমণ করার জন্য মৃগী নদী পার হই। নাহিদ সাঁতার জানত না, তাই তাকে পিঠে করে নিয়ে নদী পার হতে হয়। আড়াইটার দিকে কলেজ ক্যাম্পের কাছে পৌঁছাই। তিন জনের হাতেই ছিল গ্রেনেড। বাকি পাঁচজন রাইফেল বহন করছিল। আমি গ্রেনেড নিক্ষেপের পাঁচ সেকেন্ড পর নাহিদ আর লাফিজও নিক্ষেপ করে এবং আমরা সাথে সাথে দৌড়াতে থাকি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। তীব্র গোলাগুলি আরম্ভ হয়ে যায় সাথে সাথে। দৌঁড়াতে গিয়ে আমি পড়ে যাই। নাহিদ আমাকে তুলে নেওয়ার জন্য পিছিয়ে আসে এবং বলে "বন্ধু জলদি হাত দে এখানে প্রায় পঞ্চাশ জন আর্মি আছে।" নাহিদের হাতটা ধরার জন্য হাতটা বাড়াই সাথে সাথেই গুলি নাহিদের মাথাটা আমার কাঁধে এসে পরে। নাহিদের প্রাণহীন দেহ ঢলে পড়ে আমার ওপর। আমার শরীর একদম ঠাণ্ডায় জমে যায়। চোখ থেকে বৃষ্টির মতো জল ঝরতে থাকে। আশে পাশে কী হচ্ছে কোন শব্দ আমার কানে পৌঁছায় না। লাফিজের হাতের স্পর্শে বাস্তবে ফিরে এসেছি। লাফিজ আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। কলেজ ভবনে আগুন দেখতে পেলাম। বাকি পাঁচ জনও শহিদ হয়েছে। সূর্যের আলো ফুটে ওঠতে এখনো ঘণ্টাখানেক বাকি। লাশের গন্ধ নাকে আসছে। আমাদের বুঝার বাকি রইল না যে, পাশেই গণহত্যা হয়েছে। তাই আমরা অন্য পথ দিয়ে যেতে লাগলাম। রাগে কষ্টে আমি তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বললাম "নাহিদ, তোর আর স্বাধীন দেশে ফুটবল খেলা হলো না। তুই আর কোনদিনও আমাদের সাথে বরই চুরি করতে যেতে পারবি না।" এইসব বলছি আর হাঁটছি। আমরা ক্যাম্পে প্রায় পৌঁছে গেছি। আর মাত্র ৭/৮ কিলোমিটার হাঁটলেই পৌঁছে যাব। পূর্ব আকাশে সূর্যের লাল আভা। আমি আর লাফিজ কাটা ছেঁড়া শরীর নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ আমার পায়ের নিচের মাটি নিচে নেমে গেল। বুঝতে বাকি রইল না যে আমি মাইনে পা দিয়েছি। আতঙ্কিত কণ্ঠে লাফিজকে বললাম, "আমার বুঝি আর বাড়ি ফেরা হলো না রে। আমার পায়ের নিচে মাইন।" লাফিজ বলল, "কার মৃত্যু কোন জায়গায় রয়েছে আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারে না।" কথাটা বলে লাফিজ আমার কাছে আসল। লাফিজের সাথে বুক মিলিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম। আর বললাম "আমাদের পরবর্তী আড্ডাটা ইনশাল্লাহ জান্নাতে হবে। মাকে বলিস, আমি তাকে ভালোবাসি। আমার খাটের তোষকের নিচে দশটা টাকা রাখা আছে সেই টাকা দিয়ে তুই মাকে একটা পতাকা কিনে দিস।" আমাদের দুজনের চোখের অশ্রু মিলে একাকার হয়ে গেছে। প্রায় পাঁচ মিনিট লাফিজকে জড়িয়ে ধরে আছি। তারপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি ছিটকে পাশে পরে যাই। জ্ঞান ফিরলে ডান পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করি। পাশে ফিরে দেখতে পাই বন্ধুর বিকৃত লাশ মাইনের ওপর পরে আছে। মাইনের স্প্রিন্টারগুলো তার দেহকে খড়ের স্তূপের মতো ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। আমার ডান পা সম্পূর্ণভাবে থেতলে গেছে। আমি হামাগুড়ি দিয়ে লাফিজের দেহকে বুকে জড়িয়ে নেই। আর পাগলের মতো বলতে থাকি, "বন্ধু কথা বল। তুই যদি চুপ করে থাকিস তাহলে আমি কার সাথে গল্প করব? আমি কার সাথে ফুটবল খেলব? নাহিদও শহিদ হলো তুই ও শহিদ হলি বাকি রইলাম আমি এই হতভাগা।" আমি পাথরের মত সেখানেই ভাঙা পা নিয়ে বসে রইলাম। আজও সেই কষ্টটা আমার বুকে রয়ে গেছে। তাই সেই কথা মনে হলে আজও আমার চোখ থেকে অশ্রু নেমে আসে। কিন্তু এত কষ্টের মাঝেও আমার গর্বের বিষয়-আমি বীর শহিদের বন্ধু।

সাদা ফুল

সাব্বির হোসেন সাকিব
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা- D, রোল-৩৫১

"শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড"- ভাই, এইটা খায় না মাথায় দেয়?

-"নারে ভাই, এটা খায়ও না মাথায়ও দেয় না। এটা ছোট বেলায় মাথায় ইনজেকশনের মতো ঢুকিয়ে দেয়। জাতির জাতীয় স্লোগান"। হা হা হা .....।

ভার্সিটি ক্যাম্পাসে ঢুকতেই কথাগুলো কানে আসলো। শুনেই বুঝা গেল বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে একহাত নিয়ে নিয়েছে ছেলে দুটো।

আহ! শিক্ষা। স্কুল-কলেজ আর এখন বিশ্ববিদ্যালয়। আরো কত কী! উহুঁ! না! ভার্সিটিতে ঢুকতেই গভীর চিন্তায় মগ্ন হলাম। পুরো দার্শনিক টাইপ। তবে হ্যাঁ এ প্রসঙ্গে কলেজ জীবনের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। বেশিদিন আগের নয়। ভার্সিটিতে এবছর নিয়ে দু'বছর আর কলেজের এক বছর- হ্যাঁ ঠিক তিন বছরই। বাহ! সময়টাও দেখি মনে আছে।

'কলেজ' নামটা শুনলেই প্রথমদিকে বুক কেঁপে উঠতো। বড় ভাইদের কথা শুনেই এমনটা হতো। কলেজ জীবন মানেই নাকি 'প্যারা'। হ্যাঁ কথাটা বেশির ভাগই সত্য বটে। পড়ালেখা তো প্যারাই। আর ইন্টারমিডিয়েটে তো তা কাঞ্চনজঙ্গার সমান হয়ে যায়।

ভয়ে দুরু দুরু বুক নিয়ে কলেজে ঢুকি। কলেজটা বেশ ভালোই। দেখতে খুবই সুন্দর। কিন্তু কলেজের নামটা কী বিচ্ছিরি কলাগাছা মহাবিদ্যালয়। কলাগাছা অ্যাঁ! এই নামে কোনো জায়গা আছে বলে তো জানিনা। ইস! নাম আর পেলোনা। তবে নামে কী এসে যায়। রেজাল্ট তো দুর্দান্ত!

কলেজে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই কিছু বন্ধু পেয়ে গেলাম। তৌহিদ, রিয়াদ, রাকিন, সবুর, হাকিম, মুক্তাদির এরাই ছিল আমার বন্ধু। হ্যাঁ, আরেকজন ছিল, হাসান। ছেলেটা দেখতে অনেকটা নায়ক সালমান শাহ'র মতো! গোলগাল মুখ, সুন্দর, লম্বা মোটামুটি। কলেজের বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীর মতো সেও ছিল এক সাধারণ কৃষকের সন্তান। কলেজের পাশে "ব্যাচেলর ছাত্রাবাসে" থাকতো সে। তার বাবা ছিল খাঁটি বাঙালি কৃষক। মানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া খাঁটি কৃষক। হাসানদের পরিবার খুব একটা সচ্ছল ছিল না। তবে তার বাবার ইচ্ছা ছিল হাসানকে বড় ডাক্তার বানানোর।

-"অ্যাঁ! ডাক্তার। আব্বা আর কিছু পেলো না। আমাকে ডাক্তার বানাতে চায়।" বলল হাসান।

আমি জিজ্ঞেস করলাম-"কেনো, তুমি ডাক্তার হতে চাও না?

"না"- সটান জবাব হাসানের।

-" তাহলে কী হতে চাও?"

-পড়ালেখা কম করে যা হওয়া যায় তাই হতে চাই।

-"শুটকির ব্যাপারী হওয়া যায়।" মজা করে বললাম। তোমার পড়ালেখা করতে ভালো লাগে না?

-লাগে। কিন্তু যদি মাথায় কিছু না ঢুকে তখন কি আর ভালো লাগে? তাই আমার দ্বারা এত পড়ালেখা সম্ভব না।"

ছেলেটা কী বলে! পড়ালেখা সম্ভব নয়! তার বাবা কতো কষ্ট করে মাসে মাসে এতগুলো টাকা পাঠায়।

হাসানের বাবা অনেক কষ্ট করেই টাকাগুলো পাঠাতো। একথা হাসানই আমাদের বলেছিল। কিন্তু মুখে বললে কী হবে অন্তরে তো বাবা-মায়ের কষ্ট বোঝে না। শুধু হাসানকে বলে কী হবে আমরাই আর কত বুঝি! কোনোদিন তাদের কষ্ট ও পরিশ্রমের কথা চিন্তাও করি না। নিজেদের তালেই আছি।

তবে হাসানের কথাও তো সত্যি। সবাইকে দিয়ে তো আর সব হয় না। যার যেমন ক্ষমতা তাকে তো ততটাই করতে দেওয়া উচিত।

বেশ কিছুদিন ধরেই হাসানের চোখ-মুখ কেমন ফ্যাকাসে লাগছে। মনে হয় কত রাত ঘুমায় না। "যাক ছেলেটা তাহলে রাত জেগে পড়াশুনা করছে।

হাসান বলল, চল একটু ঘুরে আসি।

-কোথায়?

আসাদ স্যারের কাছে। আসাদ স্যার আমাদের ক্লাস টিচার। তার কাছে যাওয়াই যায়। কোনো বিশেষ দরকার? জিজ্ঞাসা করলাম।

-হ্যাঁ। স্যারের ফোন দিয়ে আব্বাকে একটু ফোন করব।
-কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি?
-না, সমস্যা না। তুমি আমার সঙ্গে আসো।

আসাদ স্যারের ফোন থেকে হাসান তার বাবাকে ফোন করেছিল টাকার জন্য। ফোনে তাদের কথাবার্তার কিছু অংশ আমি শুনতে পেলাম। হাসান মাসিক খরচের টাকা পেয়েছে অনেক আগেই। আজ মাসের ১৭ তারিখ। সামনে কোনো পরীক্ষাও নেই। এখন তাহলে আবার টাকা কেনো? বুঝতে না পেরে হাসানকে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু হাসান জবাব না দিয়ে এড়িয়ে গেল।

মানুষের জীবন নাকি গাছের পাতার মতো। গাছ যখন পুষ্টি পায়, গাছের পাতার সবুজে সে গাছ ভরে ওঠে। আর অযত্ন বা শীতের রুক্ষতায় সে পাতা ঝড়ে পড়ে।

কিছুদিন আগেই আমাদের বর্ষ উত্তরণী পরীক্ষার রেজাল্ট হলো। আমি পাশ করে গেলেও হাসান পারেনি। তাই হাসান পরের ক্লাসে উঠতে পারবেনা এটাই নিয়ম। কলেজের নিয়ম অনুযায়ী আসাদ স্যার তার বাবাকে ডেকে আনলেন। হাসানের বাবা স্যারকে অনুরোধ করে তাকে পরের ক্লাসে ওঠাতে রাজি করালেন।

যাওয়ার সময় হাসানকে ডেকে বললেন, "দেখ বাজান, তোর জন্য আমরা কত কষ্ট করতেছি। তোর মাসে মাসে এতগুলো টেহা দিতেছি। যা চাস, তাই দিতেছি। আমরা চাই তুই ভালা থাক। আর ভালা কইরা পড়ালেখা কর। আগেরবার তোর মার অসুখ হইলো আর ঐ সময়ে তুই টেহা চাইলি। তোর মা নিজের চিকিৎসা না কইরা পুরা টেহাই তোরে দিতে কইছে। আমি সব টেহাই তোরে দিছি। তোর মারে ডাক্তার দেহাইতে পারি নাই। বাজান, ভালা কইরা পইড়া তোর ডাক্তার হওয়া লাগব। তুই ডাক্তার হইয়া তোর মায়ের চিকিৎসা করবি। আমাগর কষ্ট দূর করবি। পারবি না?"

-হ্যাঁ, হাসান নিচু স্বরে জবাব দিল।

কথাগুলো বলার সময় হাসানের বাবার গলা কাঁপছিলো। চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল বারবার। ঘামে ভেজা গামছাটা দিয়েই তিনি সেই অশ্রুসজল চোখ দুটো মুছছিলেন। কিন্তু স্বপ্ন দেখা চোখ তো এতো সহজে দমে যাবার পাত্র নয়। ঐ চোখ দুটোও দমে যায়নি। আমারও তখন কান্নায় বুক ফেটে যাচ্ছিল। বারবার আমার বাবা-মায়ের কথা মনে হচ্ছিল।

কিন্তু হাসান শোধরালো না। কেন শোধরায়নি তা যখন জানতে পারলাম তখন আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। হাসান কয়েকমাস ধরেই নাকি তার বাজে বন্ধুর সাথে মিশে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমরা কিছু জানতেই পারিনি। কেন জানতে পারিনি তাও জানিনা। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হতে লাগলো। তবে কেমন বন্ধু আমরা?

ধীরে ধীরে সে এতটাই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে বৃক্ষের পাতা ঝরতে বেশি সময় লাগলো না। সেও নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে জীবনটাকে নষ্টের পথে নিয়ে গেল। কুঁড়ি ফোটার আগেই সেই কুঁড়ি ঝরার প্রান্তে পৌঁছাল। কিন্তু সেই কুঁড়ি ঝরে মাটিতে পড়েনি। পড়েছিল মহান মানুষের হাতে। যিনি কিনা মানুষ গড়ার কারিগর। আমাদের আসাদ স্যার। তিনিই হাসানের এই বিপদের অশনি সংকেত যখন প্রথম শুনতে পেলেন তখন এগিয়েও এলেন সবার প্রথমে। অমনোযোগী, ফাঁকিবাজ, বেয়াদব এসব ভেবে দূরে ঠেলে দেননি। কাছে টেনে নিয়েছিলেন আরো বেশি করে। স্যারের কল্যাণেই হাসান ফিরে পেয়েছিল নতুন জীবন। পেয়েছিল নতুন পথের সন্ধান। হয়তো ডাক্তার হবে না। কিন্তু 'মানুষ' তো হয়ে উঠবে। হয়ে উঠবে আলোকিত মানুষ। হয়ে উঠবে 'সাদা ফুল'। স্যার যেমন বলতেন,

"তুমিই তো সাদা ফুল
যাতে নেই কোন দাগ
তুমিই তো সেই সাদা ফুল
যাতে রাগ নয়, আছে অনুরাগ।

জেনে রাখো তুমিই সাদা ফুল
নও রাতের আকাশে উজ্জ্বল ফানুস
সেই সাদা ফুল-
শান্তির পায়রা, আলোকিত মানুষ।"

সেই আশাতো করাই যায়। কেননা বুকে আশার বীজ বপণ করে এগিয়ে যাওয়ার নামইতো জীবন।

আনন্দভ্রমণ

আহ্‌নাফ শাহ্‌রিয়ার রাতুল
শ্রেণি-৭ম, শাখা-ঙ, রোল-৯৯

সময়টা হলো ২০১৯ সাল। আমি ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। আমরা তখন পাঁচ বন্ধু। আমি, আলিফ, নয়ন, কাজল আর তুহিন। আমরা সকলেই একে অপরের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। যে কোনো বিপদে-আপদে সবাই আমরা একে অন্যের সহযোগিতায় এগিয়ে আসি।

কাজলের বাবা নেই শুনে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। আমাদের চোখে পানি চলে এলো। আমরা নিজেরা নিজেরা বলতে থাকলাম আমরা কেমন বন্ধু।

আমার মামা একদিন আমাকে ডেকে বললেন যে, আমাকে ও আমার বন্ধুদের কক্সবাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য টিকিট কেটে রেখেছেন। আজ ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখ। ভ্রমণে যাওয়া হবে মার্চের ৩ তারিখে। তাই আমি ঠিক করলাম আজকে স্কুল ছুটির পর ঘটনাটা সবাইকে বলব। স্কুল ছুটি হলো ২ টায়। সবাইকে সাথে নিয়ে মাঠে এলাম। সবাইকে বললাম, 'জানিস আমার মামা তোদের জন্য কক্সবাজার ভ্রমণে যাওয়ার টিকিট কেটে রেখেছেন। তোরা আমার সাথে যাবি?" সঙ্গে সঙ্গে সবাই রাজি। শুধু কাজল ছাড়া। আমি বললাম, 'তুই যাবি না কি?'। কাজল বলল, 'আমার একটু কাজ আছে। সেটা শেষ হোক, তাহলে দেখি যেতে পারি কি না'। নয়ন বলে উঠল, "তোর খালি দেখি দেখি। ঈদের দিনে এক পাঞ্জাবি কিনব তাতেও দেখি, আবার ঘুরতে যাওয়ার জন্য সবাই একই জামা কিনব তাতেও দেখি। তোর দেখি স্বভাবটা কবে যাবে বলতো?" কাজল কেঁদে উঠল। কেঁদে কেঁদে নিজের সাইকেলটা নিয়ে চলল বাড়ির পথে। আলিফ বলল, 'যা! কাজলকে আর নিয়েই যাবো না, আর ভালো' লাগে না। ভ্রমণে যাওয়ার সময় এসে গেল। যাওয়ার পাঁচ দিন আগে তুহিন বলল, "কাজলের সাথে এমন আচরণটা মোটেই ঠিক হয়নি।" তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম কাজলের বাড়ি গিয়ে ওকে নিয়েই ভ্রমণে যাব। আমরা নিজেদের সাইকেলে চড়ে ওর বাড়ির দিকে রওনা হই। কাজলের বাড়ি যেতে যেতে আমরা ঘেমে অস্থির। তাই একটা ভাঙা ব্রিজের পাশে গিয়ে খোলামাঠে কতক্ষণ বসে থেকে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলাম, "কাজলের বাড়ি এত দূর! কীভাবে সাইকেল চালিয়ে সে স্কুলে যাওয়া-আসা করে!" রাস্তায় কোনো লোকজন নেই। হঠাৎ আলিফ বলল, ওই যে! এক লোক এদিকে আসছে। লোকটিকে আমি বললাম, 'চাচা, কাজলদের বাড়ি চিনেন?'

'কাজলের বাড়ি যেতে চাইছ কেন?' 'আমরা কাজলের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। আমরা ভ্রমণে যাব বলে কথা কাটাকাটিতে ওর মন খারাপ হয়েছে, তাই ওর বাবার সাথে কথা বলতে যাচ্ছি।'

তোমরা জান না কাজলের বাবা মারা গেছে ওর শৈশবকালেই।

আমি বললাম, ওর বাড়ি কোনদিকে একটু বলবেন?

ওর বাড়ি সোজা গিয়ে ডানদিকে। কাজলের বাবা নেই শুনে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। আমাদের চোখে পানি চলে এলো। আমরা নিজেরা নিজেরা বলতে থাকলাম আমরা কেমন বন্ধু।

সাইকেল নিয়ে আমরা কাজলের বাড়িতে পৌঁছলাম। দেখি কাজল তার অসুস্থ মায়ের সেবা করছে। আমাদের দেখে আবার কেঁদে উঠল। আমরা বললাম কাঁদিস না, ভুল আমাদেরই ছিল। তুই কাঁদিস না! আমি আমার মামাকে বলব ভ্রমণের তারিখ পিছিয়ে দিতে। আন্টি ভালো হলে উনাকে নিয়ে তারপরই ভ্রমণে যাব। আনন্দের ভ্রমণে বন্ধুদের ছাড়া একটি মুহূর্তও কল্পনা করা যায় না।

শেষ প্রহর

মুনমুন জাহান
শ্রেণি-৮ম, শাখা-চ, রোল-১৭

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী নিরা। বনভোজনে মধুপুর গিয়েছিল তাদের স্কুল থেকে। সেখানে গিয়ে অনেক আনন্দ করেছে নিরা। চকোলেট, বিস্কিট, কোক, কেক আরও অনেক কিছু খেয়েছে। বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মেতে উঠেছে, অনেক ছবিও তুলেছে। যখন দুপুর হলো, তখন তারা সবাই মিলে একসাথে রান্না করেছে। দুপুরে সবাই একসাথে খাবার পরিবেশন করেছে এক সাথে খেয়েছে। দুপুরে খাওয়ার পর তারা একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ঘোরাঘুরির জন্য বেরিয়ে পড়েছে। সেখানেও আনন্দ আর আনন্দ। এক সময় বাসায় ফেরার সময় ঘনিয়ে এলো। তারা গাড়িতে ওঠল। গাড়িতে অনেক গান-বাজনা চলল। সবাই গাড়িতে নাচানাচিও করল। কৌতুক-হাস্যে গাড়িতে রোল পড়ে গেলো। নিরা এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে গেলো। পরে তার সিটে বসে সে মনে মনে ভাবতে লাগলো আজ বাসায় গিয়ে তার মা-বাবাকে বলবে যে আজ সে বন্ধুদের সাথে কতো মজা করেছে। তার আজকের দিনটি তার জীবনের সবচেয়ে ভালো দিন ছিল। সে তার ছোট ভাইয়ের জন্য কয়েকটি খেলনা কিনেছে। ছোট ভাই খেলনাগুলো পাওয়ার পর কীভাবে আনন্দে মেতে উঠবে তা-ও কল্পনা করছিল নিরা। তার মন যেন খুশিতে মেতে উঠছে। এতো খুশি আগে কোনোদিনও হয়নি নিরার। যখন নিরা এসব কিছু ভাবছিলো, তখনই তার ডাক পড়লো। গাড়িতে রতন স্যার ছিলেন। তিনি বললেন 'নিরা, তোমার বাসার মোড় এসে গেছে। তুমি চাইলে নেমে যেতে পারো।' নিরা খুশি, এখন রাস্তাটা পার হওয়ার বাকি। রাস্তাটা পার হলেই সে বাসায় চলে যাবে আর আজকের দিনে কী কী করেছে তা তার বাবা-মাকে বলবে। এসব কিছু ভাবতে ভাবতে সে গাড়ি থেকে নামলো। বাসের সবাই তাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলো। সে আনন্দে যখন রাস্তা পার হতে শুরু করল, ঠিক তখনই একটি ট্রাক দ্রুত বেগে এসে নিরাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। নিরা রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। রক্তে ভেসে গেল রাস্তা। টিপ টিপ চোখে সে বাসার দরজা আর ঝুলন্ত বারান্দাটি দেখল। তার চোখে শুধু ভাসতে লাগলো বনভোজনের স্মৃতিগুলো। আর তার মনে হতে থাকলো তার মা যেন তাকে কাঁদো কাঁদো গলায় বলছে, 'যাস নে মামণি, যাস নে!' চোখে ভেসে ওঠল তার বাবার মিষ্টি হাসি আর ছোট ভাইয়ের কোমল মুখটি। নিমিষেই শেষ হয়ে গেলো তার সকল কল্পনা। চোখ দুটি ছলছল অবস্থায় বন্ধ হয়ে এলো।

যথাসম্ভব ফুটওভারব্রিজ ব্যবহার করবেন। সময়কে বাঁচাতে নিজের জীবনকে ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেবেন না। মনে রাখবেন, 'সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি।' যদি আমরা একটু সচেতন থাকি, তাহলে অনেক নিরার জীবন এরকম দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাবে।

আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ। দয়া করে রাস্তা পার হওয়ার আগে ডানে-বামে তাকিয়ে রাস্তা পার হবেন। যথাসম্ভব ফুটওভারব্রিজ ব্যবহার করবেন। সময়কে বাঁচাতে নিজের জীবনকে ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেবেন না। মনে রাখবেন, 'সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি।' যদি আমরা একটু সচেতন থাকি, তাহলে অনেক নিরার জীবন এরকম দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাবে।

গাছের জন্য ভালোবাসা

মো. সাদমান ফেরদৌস (তৌসিফ)
শ্রেণি-৪র্থ, শাখা- গ, রোল- ৭৪

রূপনগর গ্রামে বাস করত দুই ভাই। বড় ভাইয়ের নাম জিতু। ছোট ভাইয়ের নাম তপু। জিতু শান্ত-ভদ্র ভালো ছেলে। তপু অশান্ত ও দুষ্টু ছেলে। তারা দুইজনই স্কুলে যায়। জিতু আর অপু একই শ্রেণিতে পড়ে।

একদিন প্রধান শিক্ষক ক্লাসে আসলেন। তিনি ক্লাসের ছাত্রদের অবস্থা ও লেখাপড়ার খোঁজ খবর নিলেন। আর তিনি গাছ সম্পর্কে কিছু কথা বললেন।

তিনি বললেন, "গাছ আমাদের পরম বন্ধু। আমরা কখনো গাছ কাটব না। গাছ আমাদের ফল দেয়। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য গাছ প্রয়োজন। গাছ অক্সিজেন দেয়। সেজন্য আমাদের বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।" কথাগুলো জিতুর খুব ভালো লাগল। কিন্তু তপু কথাগুলোকে পাত্তাই দিল না। জিতু সেদিন থেকে অনেক গাছ লাগাতে থাকলো। গাছের যত্ন নিতে লাগল। কিন্তু তপু গাছের পাতা ছিঁড়ে, ডাল ভাঙে এবং ডাল দিয়ে খেলে।

একদিন জিতু তার লাগানো গাছ দেখতে যায়। সে দেখে গাছে কোনো পাতা নেই। সব ডাল ভাঙা। তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। সে বুঝল এসব তপুর কাজ। তখন সে তার মায়ের কাছে গিয়ে বিচার দিল। মা তখন তপুকে ডেকে বললেন, "তুমি জিতুর গাছের ডাল ভেঙেছ কেন?" তপু বলল, আমরা তো এখানে ভাড়া থাকি কিছুদিন পরে চলেই যাবো, গাছ দিয়ে কী হবে? মা বললেন, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। গাছ না থাকলে আমরা বাঁচতে পারতাম না। তপু সেসব কথা শুনল না। একদিন স্বপ্নে দেখল গাছেরা তাকে হাতে-পায়ে পেটাচ্ছে। তপু চিৎকার করে বলল, তোমরা আমাকে মারছ কেন? গাছেরা বলল, তুমি আমাদের ডাল ভেঙেছো, পাতা ছিঁড়েছো, আমাদের কষ্ট দিয়েছো। তপু তখন বললো, তোমাদের আবার জীবন আছে নাকি?

গাছেরা বলল, কেন তুমি জানো না? বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু আবিষ্কার করে গিয়েছেন গাছেরও জীবন আছে। তপু অনুতপ্ত হয়ে বলল, আমাকে মাফ করো। আর আমি পাতা ছিঁড়বো না, ডাল ভাঙবো না।

এরপর তপুর ঘুম ভাঙল। সে বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে মাফ চাইল। সেও এখন ভাইয়ের সাথে গাছ লাগায়। গাছের যত্ন নেয়। কখনো গাছের পাতা ছিঁড়ে না। ডাল ভাঙে না। সে বুঝেছে গাছ আমাদের পরম বন্ধু।

আশ্চর্য প্রদীপের বর্তমান অবস্থা

মার্জিয়া রহমান নূর
শ্রেণি-৫ম, শাখা-গ, রোল-৫৯

বংশানুক্রমে জালাদীন বর্তমানে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মালিক। জালাদীন একদিন প্রদীপসহ অটো চড়ে গাঙ্গিনারপার যায়। মিতু ইলেকট্রনিক্সে, হ্যাঁ এটি একটি hearing shop। যেখানে কিনা কানে শোনার যন্ত্রপাতি তৈরি ও বিক্রি করা হয়। জালাদীন দোকানের সামনে দাঁড়ালো। তারপর কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে দোকানের ভেতর ঢুকল। দোকানে ঢুকে দোকানদারকে বলল-

জালাদীন: ভাই, আমাকে ইয়া বড় সাইজের একজোড়া hearing machine তৈরি করে দেয়া যাবে?

দোকানদার: অবশ্যই, এটাই আমার কাজ। তবে আমাকে ঘণ্টা খানেক সময় দিতে হবে।

এরই মাঝে দোকানদার জালাদীনের হাতের প্রদীপটি লক্ষ্য করল এবং জালাদীনের কাছে জানতে চাইল-

দোকানদার: এত বড় প্রদীপ দিয়ে আপনি কী করেন?

জালাদীন অকপটে বলল।

এটি আলাদীনের সেই আশ্চর্য প্রদীপ যা কিনা বংশানুক্রমে তার হাতেই আছে।

দোকানদার কৌতূহলী হয়ে উঠল। আর মনে মনে ভাবতে লাগল। এক ঘণ্টা সে তো অনেক সময়। এর ভেতরে প্রদীপের দৈত্যের কাছ থেকে দেখা যাক বৃহৎ কোন স্বার্থ আদায় করা যায় কিনা।

অনেকটা মিনতির সুরে দোকানদার জালাদীনকে বলল,

প্রদীপে ঘষা দিয়ে দৈত্যকে হাজির করুন। দেখি, সত্যি সত্যি দৈত্য আসে কিনা।

জালাদীন দোকানদারকে বলল,

আপনিই ঘষা দিন।

যেই কথা সেই কাজ। দোকানদার ঘষা দেওয়ার সাথে সাথেই হু হাঁ-হাঁ-হাঁ আওয়াজ করে দৈত্য এসে হাজির। দৈত্য কুর্নিশ করে দোকানদারকে বলল,

আদেশ করুন হুজুর আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?

লোভী দোকানদার হঠাৎ দৈত্যকে দেখে স্থির করতে পারেনি কী চাইবে?

দৈত্য বলল, তাড়াতাড়ি করুন হুজুর, সময় খুব কম।

তখন দোকানদার দৈত্যকে বলল,

'আমার অনেক টাকা চাই।'

দৈত্য তৎক্ষণাৎ মাদুর পেতে দিল। দোকানদার, জালাদীন এবং দৈত্য মাদুরে চেপে বিশাল এক ফাঁকা মরুভূমিতে গিয়ে হাজির হল এবং বলল-

হুজুর এই আপনার অনেক ফাঁকা।

বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দোকানদার দেখল চর্তুদিক কেবল ফাঁকা আর ফাঁকা। সে কাদঁতে কাদঁতে জালাদীনকে বলল,

আমি কী চাইলাম আর কী পেলাম!

জালাদীন বলল, আরে ভাই এই জন্যই তো আপনাকে বলেছিলাম ইয়া বড় সাইজ এর একজোড়া hearing machine তৈরি করে দিতে।

তখন, দোকানদার বলল-

হায় আল্লাহ, কেন যে এত লোভ করেছিলাম!!!

অমীমাংসিত

সুমাইয়া পারভীন রাইসা
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা- A, রোল-০৯

"টুং টুং... প্লিজ ওপেন দা ডোর।"

-ধুর বাবা, এই রাত ১১টার দিকে আবার কে এল?

মনের বিরক্তির ভাবটা ঢাকার জন্য মুখে একটি সূক্ষ্ম হাসির ছাপ ফোটানের ব্যর্থ চেষ্টা করে দরজা খুললেন প্রফেসর জাহিদ কবির।

-স্যার আস্‌সালামুআলাইকুম।

-ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম।

কে তুমি? তোমাকে তো ঠিক চিনলাম না?

-স্যার, আমি আপনার একজন ছাত্র।

-ও, আচ্ছা। তা এতো রাতে কী দরকার?

-ইয়ে মানে, স্যার, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি ভেতরে এসে কথা বলতে পারি?

জাহিদ কবির একটু লজ্জিত হয়ে বললেন-এসো এসো, আমারই আগে বলা উচিত ছিলো।

বিশ-একুশ বছরের ছেলেটি দরজা থেকে ঘরের ড্রইং রুমে প্রবেশ করলো।

জাহিদ কবির লক্ষ করলেন, ছেলেটা খানিকটা শ্যাম বর্ণের, বেশ লম্বা আর হাতের আঙুলগুলো একটু অস্বাভাবিক রকমের লম্বা। চেহারা লম্বাটে ধরনের আর কথাবার্তায় একটা সূক্ষ্ম যান্ত্রিকতার ছাপ আছে।

-বসো। তোমার নামটা কী জানতে পারি?

-জ্বি স্যার, নিশ্চয়। আমার নাম প্রত্যয় রহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

-ও আচ্ছা। কিন্তু তোমাকে তো আগে কোনোদিন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।

-বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রের ভিড়ে একজন অতি সাধারণ ছাত্রের চেহারা মনে রাখা, আমার মনে হয় বেশ দুরূহ ব্যাপার স্যার।

-হুম, তা অবশ্য ঠিকই। চা খাবে?

-না... না ... স্যার। আমার জন্য শুধু শুধু আপনার এত কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। এ অসময়ে আপনি আমার কথা শুনতে রাজি হয়েছেন এটাই অনেক।

-"না ... না ... তেমন কোন কষ্টের বিষয় না। আসলে আমার স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে গেছে। তাই সন্ধ্যার দিকে একটু বেশি করে চা বানিয়ে ফ্লাস্কে ভরে রেখেছিলাম। একটু পর পর চা খাওয়ার অভ্যাস কি না।

-ও, আচ্ছা। তাহলে ঠিক আছে।

জাহিদ কবির রান্না ঘর থেকে দু'কাপ চা নিয়ে আসলেন।

-তারপর এবার আসল কথায় এসো।

-জ্বি স্যার। আমি শুনেছি আপনি নাকি বিদেশে পিএইচডি করাকালীন 'সময়' বিষয়ক দুটি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন? আর দাবি করেছিলেন যার সমাধান করার মাধ্যমে নাকি টাইম ট্রাভেল সম্ভব।

এবার জাহিদ কবির একটু অবাকই হলেন। এ কথা ঠিক যে তিনি বেশ কয়েক বছর আগে টাইম ট্রাভেল সম্পর্কিত দুটি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এ কাজে তার সহযোগী ছিলেন তার বিদেশি বন্ধু আর্ক। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা এর সমাধানে পৌঁছাতে পারেননি। তবে সূত্র দুটি আবিষ্কার করার পর এ নিয়ে সাময়িকভাবে কিছু আলোচনা হয়েছিল। বিদেশি নামি দামি সংবাদপত্রে এ বিষয়ে আর্টিকেল ছাপা হয়েছিল। কিন্তু তারপর হঠাৎ সবকিছু থেমে গেলো আর সূত্র দুটি স্থান পেল প্রফেসরের ব্যর্থতা নামক স্টোর রুমে। কিন্তু আর্ক শেষ চেষ্টা করার জন্য এই বিষয়ের উপর 'Inconclusive Solution' নামের একটি বইও লিখেছিল। কিন্তু অবশেষে ঐ বইটিও ব্যবসায়িক কোন সফলতা না পাওয়ায় আর্কও হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু এ কথা এই ছেলে কেমন করে জানতে পারল। রহস্য আরো ঘনীভূত হচ্ছে।

-স্যার, আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। আমি কিছু ভুল বলে থাকলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

-না ... না ... ভুল কিছু বলনি। তবে আমি এর সমাধান করতে পারিনি। তাই সূত্র দুটি বাতিলের খাতায় নাম লিখিয়েছে।

-আপনি যে সূত্রগুলো আবিষ্কার করেছিলেন তা ছিল ফাংশনের জটিল সূত্র। আপনি সমাধান করতে পারেননি তা ঠিক আছে। তবে এও হতে পারে সুদূর ভবিষ্যতে কেউ এর সমাধান করে ফেলবে।

-হুম হতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা তা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি।

-তবে স্যার, মানুষ কিন্তু মাঝে মধ্যেই কম সম্ভাবনাময় বিষয়েই বেশি সফলতা দেখিয়েছে। যেমন-মানুষ আকাশে উড়বে এ স্বপ্ন মানুষের বরাবরই ছিল কিন্তু এর সম্ভাবনা তো এক সময় শূন্যের কাছাকাছি ছিল, কিন্তু এখন তো মানুষ এ বিষয়েই তাদের সফলতার পতাকা উড়িয়েছে। আর এই এরোপ্লেনের ডিজাইন লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি তো এরোপ্লেন সৃষ্টির ১০০ বছরেরও আগে এর চিত্র এঁকে বেস তৈরি করে গেছেন।

-হ্যাঁ তা ঠিক। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বল্প সম্ভাবনাময় বস্তু অমীমাংসিতই থাকে।

-আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার ধরুন কেউ একজন আপনার সূত্রের সমাধান করে বর্তমান সময়ের একটি মোবাইল ফোন দুইশ বছর আগে পাঠিয়েছিল। তখন কি হবে?

-আসলে বিষয়টা আমি কখনো এভাবে ভাবিনি। তাহলে ঐ সময়কার বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে মোবাইল ফোন তৈরির পদ্ধতি জেনে যাবে। ইনফেক্ট বিজ্ঞানের উন্নয়নের স্বতঃস্ফূর্ত ও ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে একটা চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। কিন্তু তার আগে বল এ সূত্রগুলো সম্পর্কে তুমি কোথায় থেকে জানতে পারলে?

-ধরা যাক, আর্কের মৃত্যুর ১৪৫ বছর পর 'Inconclusive Solution' আবার আবিষ্কার হলো। আর বিজ্ঞানীরা কেউ এর সূত্রগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করলেন। আর আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে এর সমাধান করে ফেললেন!

-দাঁড়াও ... দাঁড়াও ... ১৪৫ বছর এটা তুমি এত নিশ্চিত হয়ে কীভাবে বলছ?

-জ্বি স্যার সম্ভব, একমাত্র সেই হয়তো এটা সম্পূর্ণ ঠিকভাবে বলতে পারবে যে আসলে ভবিষ্যৎ জানে।

জাহিদ কবিরের গলা শুকিয়ে আসছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে।

-মানে? কি বলতে চাইছো তুমি?

-আচ্ছা স্যার, আবার ধরুন যে বিজ্ঞানীরা সময় সূত্রের সমাধান করেছিল তারাই আবার এর ভয়াবহতা সম্পর্কে অনুমান করতে পেরে ঐ সময়ের সবচেয়ে উন্নত রোবটটিকে অতীতে পাঠিয়ে দিল পৃথিবী থেকে সময় সূত্রের সকল অস্তিত্ব মুছে দিতে।

-তুমি সত্যি করে বলো তুমি কে? বেরিয়ে যাও, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও।

-স্যার আমি কে, এটা বুঝে যাওয়ার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনি। তাই না স্যার .....?

-না .... না .... এটা হতে পারে না, বাঁচাও ..... বাঁচাও ..... ।

পরদিন সকালে দেশের প্রায় সব সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হলো..

বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী ড. জাহিদ কবির।

হাড় হাভাতের এক দুর্লভ চিঠি

তানজিয়া আক্তার

শ্রেণি-১০ম, শাখা-খ, রোল-০২

প্রিয় অমাবস্যার চাঁদ

শুভেচ্ছা নিও। তোমরা সকলে এখন ডুমুরের ফুল হয়েছ। অথচ এক সময়ে আমরা ছিলাম ঝাঁকের কৈ। অনেকে বলত এক ক্ষুরে মাথা কামানো। কিন্তু কোথায় গেল সেই সুখের পায়রা আর লক্ষ্মীর বর যাত্রীরা! গৌরচন্দ্রিকা রেখে আসল কথা বলি।

আমার সিদুঁর কপালে যে, এ ধরনের ইদুঁর কপাল লেখা ছিল সেটা কে জানত? বাবার দহরম্ মহরম ওয়ালা সেইসব ঢাকের কাঠি আর বক ধার্মিকের মধ্যে কেউ কেউ মাছের মার পুত্র শোক দেখাতো। কিন্তু তারা যে বিড়াল তপস্বী সেটা বুঝতে পারিনি। তারা কৈয়ের তেলে কৈ ভেজে যাচ্ছিল। অথচ আমার কখনো টনক নড়েনি। বাবা ছিলেন টাকার কুমির আর আমি সবে ধন নিলমণি, আলালের ঘরের দুলাল সেজে টাকার গরম দেখিয়ে পালের গোদা সেজে উড়নচণ্ডীর মত ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করেছি। দুধে-ভাতে থেকে বাবার ব্যবসা বাণিজ্যের দায়িত্ব না নিয়ে হয়েছি কূপমণ্ডুক। আর তাইতো সহজেই ঐ ধামাধরা আর রুই কাতলারা পুকুর চুরি করে গণেশ উল্টিয়ে পগার পার হতে পারলো। বুঝতে না পারায় বসন্তের কোকিল আর তুলসী বনের বাঘের থাবায় আমার চাঁদের হাট তাসের ঘরের মত ভাঙন ধরল। ভাবতেও পারিনি ঐ রাঘব বোয়ালেরা এসেছিল ভিটায় ঘুঘু চড়াতে। ঐ চোখের পর্দাহীনদের কাছে আমার যক্ষের ধন বাবার টাকাগুলো হলো ছেলের হাতের মোয়া। আর গৌরী সেনের টাকা আর কংস মামাদের সাহায্য নিলাম না যেন খাল কেটে কুমির আনলাম। এখন তার আক্কেল সেলামি দিচ্ছি। এক সময়ের ননীর পুতুল এখন আমড়া কাঠের ঢেঁকি আর অনেকের চোখের মণি আজ চোখের বালি ও হাতের পাঁচ কিছু জমি নিয়ে চোখে সর্ষে ফুল দেখছি। এখন লেফাফা দুরস্থ সেজেছি, জিলিপির প্যাঁচ ওয়ালা ঐসব খয়ের খা'দের পাকা ধানে মই দেয়া দেখে আজ আমার আক্কেল গুড়ুম।

জানিনা, আমার এ কলির সন্ধ্যা কবে কাটবে! আর এ রাবণের চিতাই বা কবে নিভবে! মাঝে মধ্যে নয়-ছয় পত্র দিয়ে এই অকাল কুষ্মাণ্ড ঠুঠো জগন্নাথ বন্ধুটির খোঁজ নিস।

ইতি
হাড় হাভাতে
গোবর গণেশ
(সংগৃহীত)

কবিতা
ও
ছড়া

ছোট্ট ছেলে

সাদিকা বুশরা প্রিয়ন্তী
শ্রেণি-৫ম, শাখা-খ, রোল-১৬৫

এক যে ছিল ছোট্ট ছেলে
নামটি তার খোকন।
মা-বাবার আদর পেয়ে
সকাল-সন্ধ্যা নাচন।
পড়া শোনায় ভালো সে
সব কিছুতেই সাঁচা।
তাই তো সে স্বপ্ন দেখে
হবে দেশের রাজা।

স্বাধীন দেশ

মারজান মরিয়ম মমি
শ্রেণি-৩য়, শাখা-ক, রোল-৭৪

স্বাধীন স্বদেশ গড়তে যাঁরা
অস্ত্র হাতে নিলো,
দেশের তরে অকাতরে
প্রাণ বিলিয়ে দিলো।
দীর্ঘ 'ন' মাস যুদ্ধ করে
করলো স্বাধীন দেশ,
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে
পেলাম বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধ

নুসরাত জাহান তিশা
শ্রেণি-৮ম, শাখা-ঘ, রোল-১০

মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি আমরা
দেখেছি মুক্তিসেনা,
যাঁদের যুদ্ধে এদেশ স্বাধীন
যাঁদের রক্তে কেনা।
বহু ত্যাগ আর যাঁদের রক্তে
কেনা মোদের দেশ,
তাঁদের আশা করব পূরণ,
হতে দেব না শেষ।
অবহেলা আর বঞ্চনা যেন
তাঁদের না হয় আর,
সেই চেষ্টাই করব মোরা
শতকোটি বারবার।
আজকের দিনে আমরা সবাই
এই শপথই নেবো,
তাঁদের প্রাপ্য সম্মানটুকু
সবাই তাঁদের দেব।

আমার স্কুল

মো. মুশতাক তাহমিদ ফুয়াদ
শ্রেণি-৫ম, শাখা-ঘ, রোল-৩২

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ পড়ি, এই আমাদের গর্ব,
ভবিষ্যতের জীবন আমরা এখান থেকেই গড়ব।
মায়ের মতো ম্যাম আমাদের পিতৃতুল্য স্যার,
প্রাণে দরদ, মুখে শাসন, পড়ান চমৎকার।
ঝগড়াঝাটি করি না আমরা, আছে সবার জানা,
গুরুজনের আদেশ মানব, শুনি তাদের মানা।
বিদ্যালয়ে আসি আমরা, সেই যে সকাল বেলা,
লেখাপড়া করেই আমরা কাটাই সারা বেলা।
ভালো স্কুল বলে সবাই স্বীকৃতি দেয় ভাই,
বিদ্যালয়ের সুনাম আমরা রক্ষা করব তাই।
ভর্তি হতে অনেকে জানি করে আনাগোনা,
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের নাম
কার না আছে জানা!

আমার মা

শাহরিয়ার নাফিজ সাদ
শ্রেণি-৫ম, শাখা-খ, রোল-১০৩

গোলাপ ফুলের রূপটা দেখে
পাই যে আমি সুখ,
তার চেয়ে বেশি সুখ আমি পাই
দেখলে মায়ের মুখ।
মেঘ বালিকা উড়ে যখন
দেখতে লাগে বেশ,
তার চেয়ে বেশি আনন্দ পাই
দেখে মায়ের কেশ।
মুগ্ধ করে ভোর সকালে
ডাকলে পাখির ঝাঁক,
তার চেয়ে মুগ্ধ করে
আমার মায়ের ডাক।

আকাশের ভাবনা

জাফরানা ইয়াসমিন (মিমি)
শ্রেণি-৫ম, শাখা-গ, রোল-৩৫

চেয়ে দেখ আকাশে
কত তারা ফুটেছে,
মিটিমিটি জ্বলে যেন
জোনাকিরা ছুটেছে।
বসে আছি উঠানে
চোখ দুটি ওখানে,
ঘর থেকে দিদি বলে
আয় খুকি পিঠা নে।
দিদি তুমি ডেকো না
পিঠা আমি খাব না,
পিঠা খেলে ভুলে যাব
আকাশের এ ভাবনা।

বন্ধু

নিশাত জাহান দিবা
শ্রেণি-৮ম, শাখা-চ, রোল-১২৪

যে জন বলে এ পৃথিবীতে তার কোনো বন্ধু নাই,
তার মতো অভাগা এ জগতে আরেকটি নাই।
বন্ধু ছাড়া কোনো কাজ হয় না সম্পূর্ণ,
বন্ধু হলো সেই জিনিস যেটি ছাড়া জীবন অপূর্ণ।
এ জীবনের শুরুটা হয় 'মা' নামক বন্ধু দিয়ে,
জীবনটাকে চলতে শিখিয়েছে আদর-শাসন দিয়ে।
হাঁটি হাঁটি, পা পা করে হাতের আঙুল ধরে,
বাবা ছাড়া কোনো বন্ধু কি আর হাঁটতে শেখাতে পারে?
জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে বিদ্যালয়ে যাই,
নাম না জানা কত শত বন্ধু সেখানে খুঁজে পাই।
আসল বন্ধু নিতে হয় চিনে খাঁটি সোনার মতন,
সুখে দুঃখে যে হবে তোমার সবচেয়ে বেশি আপন।
যখন তোমার ব্যথিত হৃদয় নিঃসঙ্গতার চাদরে ঢাকা,
বন্ধু তোমায় বুঝতে দেবে না তুমি যে আছো একা।

ফেরা

জাফরিন সুলতানা অথৈ
শ্রেণি-৮ম, শাখা-চ, রোল-৮৭

অনেক স্বপ্ন বুকের ভেতর
বাঁধবো সুখের ঘর,
সেই আশাতে এলাম মাগো
তোমায় ছেড়ে শহর।

মাগো, তুমি দোয়া করো
রুখবো তোমার দুখ,
তোমার কথা মনে হলে
ভাঙে আমার বুক।

কোথায় গেলো সবুজ মাঠ
বাউল সুরের বাঁশি?
এই শহরে পাইনা খুঁজে
তোমার মধুর হাসি।

একলা থাকি, মাগো আমি
একলা ঘরে রই,
স্বপ্নেও আমি কেঁদে উঠি
মাগো, তুমি কই?

এই শহরে থাকবো না আর
যাবো গ্রামে ফিরে,
আমার সুখের নীড় যে মাগো,
তোমার ভাঙা কুঁড়ে।

ত্বোহা ভাই

তাশফি রহমান
শ্রেণি-৮ম, শাখা-চ, রোল-১৮৭

আমাদের ক্লাসে আছে ত্বোহা ভাই,
সিঙ্গারার সাথে তার প্যাটিস চাই।
সবসময় ব্যস্ত থাকে ক্রিকেট খেলায়,
এমনি করে তার দিন চলে যায়।
ছেলে সে ভালো,
দেখতে একটু কালো
ক্লাস দেয় ফাঁকি,
পড়া রাখে বাকি।
রেজাল্ট করে মন্দ,
বাবার সাথে দ্বন্দ্ব।
বন্ধু তার তিনজন,
কথা বলে সারাক্ষণ।
সবাই বলে দুষ্টু,
তা শুনে সে সন্তুষ্ট।
ছোটদের করে আদর,
সবকটা হচ্ছে বাদর।
ভালো তার মন,
করে ভালো পণ।
যখন দেখে চাঁদ,
সব চিন্তা বাদ।
তার আছে অনেক আশা,
তার জন্য থাকলো মোদের স্নেহ-ভালোবাসা।

খেলা পাগল

মো. আল মামুন সাকিব
শ্রেণি-১০ম, শাখা-ঙ, রোল-১৬

পড়া পড়া পড়া
পড়তে পড়তে জীবনটাই যেন জড়া জড়া !!
মা বলে পড়তে বসো, বাবা বলে লেখো,
স্যার বলে সব ছেড়ে আমার পড়া শেখো।
আপু বলে ভূগোল পড়ো পৃথিবীকে জানো,
ভাইয়া বলে বাংলা পড়ো আমার কথা মানো।
হুজুর বলে আদব শেখো আছে কিতাবে
সব ছেড়ে পালিয়ে যাই খেলতে খেলার মাঠে।
খেলা আমার অতি আপন
পড়ার চেয়ে করি যতন,
খেলা আমার সবকিছু, খেলাই আমার সাথী
তাইতো আমি খেলতে এত ভালোবাসি।

প্রতীক্ষা

মো. সিফাত আকন্দ
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-G, রোল-৪৮৪

আবার হয়তো বা আমাদের দেখা হবে,
দুর্বা ঘাসের সবুজ গালিচায় বসে।
কথা হবে অনেকখানি, বোঝা যাবে
তা নিতান্তই খানিকক্ষণ।
হবে গদ্যরস, পদ্যরস, যাপিতরস
বাদ যাবে না হয়তো;
প্রেমের আদি অনাদি ইতিহাস
আবার দেখা হবে হয়তো, আঁধারের
কালো মেঘ কেটে,
দুর্বাদলের গালিচায় বসে
গোধূলি বিকেলের এক খণ্ড;
অনেক যত্নে লালিত সময়ে।

প্রিয় শিক্ষক

শাহরিয়া আলম তন্বী
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-B, রোল-২৪৬

শিক্ষক মানে- কঠোরতা নয়
মায়াভরা শাসন,
শিক্ষক মানে-মমতাময়ী
মায়ের মতো আপন।
শিক্ষক মানে-প্রেরণা জোগায়
বাবার মতন,
শিক্ষক মানে-অতি সুমহান
মহা গুরুজন।
শিক্ষক মানে-জ্ঞানদাতা
জ্ঞানের সমাহার,
শিক্ষক মানে-সুশিক্ষিত
জাতি গঠনের হাতিয়ার।
শিক্ষক মানে-লক্ষ্যে পৌঁছানোর
পথ-প্রদর্শক,
তাইতো পেশায় সবার ওপরে
স্থান পেয়েছেন শিক্ষক।

ভিন্ন আমি

মায়িশা হক স্নেহা
শ্রেণি-১০ম, শাখা-ক, রোল-১৭৮

কল্পনার জগৎ আমার এতোই প্রসারিত,
জীবনটাকেও গুছিয়ে নেই সেথায় নিজের মতো।
কখনো দেখি জাদুর স্বপ্ন উড়ছে অবিরত,
আমিও ঘুরছি পিছুপিছু ভুলে দুঃখ যতো।
রং বে রং এর স্বপ্ন আঁকি করে মনের মতো,
কখনো আমি করে থাকি-
পাগলামি আছে যত।
হঠাৎ বাস্তবতায় ফিরে-
চারিদিকে চেয়ে দেখি,
কেউই তো নয়-আমার মতো।

৮ই ফাল্গুন

আসিফুল হাসান আসিফ
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-C, রোল-১৪৫

সেদিন সকাল জুড়ে
কুয়াশার আনাগোনা ছিল।
আজও সকাল থেকেই
কুয়াশার ভিড়।
সেদিন বাতাসে বসন্ত বসন্ত
ঘ্রাণ ছিল।
আজও এই বাহারি ঢাকায়
বসন্তের ভিড়।
সেদিন কুমড়ো ফুল, সজনে ফুল
শিমুল পলাশ ছিল।
আজও পুকুরের ধার,
পলাশ রঙে রাঙা।
সেদিন ভাঁট ফুল,
আর এর বোল ছিল।
আজও কৃতজ্ঞ প্রকৃতি,
ফুলে ফুলে রাঙা।
সেদিন তারুণ্যে দীপ্তি ছিল,
ছিল দুপুরের রৌদ্রদগ্ধ আকাশ।
আজও দুপুর গড়াতেই; ভীষণ রোদে,
তেতে উঠেছে নিঃশ্বাস।
সেদিন দাবি আদায়ের
আগুন ছিল।
ছিল ৮ই ফাল্গুন।
সেদিন রক্ত ঝরানোর
শপথ ছিল।
ছিল ভাষার প্রতি ভালোবাসা
নিদারুণ।
সেদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে
দাবি ছিল।
আজও আছে দাবিগুলো সেই।
সেদিন সালাম, রফিক, বরকত ছিল।
আজও আছে অমলিন।

পেছনে পড়া দুঃসাহস

আয়েশা ইসলাম
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-F রোল-৫৮৫

তোমাকে ভালোবাসারও বহু আগে, হে আমার দেশ
মানুষ ভালোবাসার কী বিশাল সব ইতিহাস গড়ে রেখেছে!
তোমার অপেক্ষায় থাকারও বহু আগে-
মানুষ অপেক্ষার কি বিশাল সব সমুদ্র পার হয়ে গেছে!
তোমাকে নিয়ে দু কলম লেখারও বহু আগে-
লেখা হয়ে গেছে গদ্য।
কি অপূর্ব তাদের গঠনশৈলী!
ভালোবেসে লেখা হয়েছে পদ্য-
কিশোরের সদ্য ভাঙা স্বরের মতো যাদু তাদের গঠনে!
তবু দেখেছো কী নির্লজ্জ দুঃসাহস আমার
ভালোবাসতে শিখেছি,
ভালোবাসা কলমে প্রকাশ করতে শিখেছি!

মায়ের স্মৃতি

হালিমাতুজ সাদিয়া
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-F, রোল-৪৬০

মা তোমায় মনে পড়ে
খুব যতনে আদর করে
রাখতে যেমন করে
মা সেই স্মৃতি মনে পড়ে।

মা তুমি কোথায়?
একা একা বসে থাকি
খুঁজে পাই না তোমায়
ভেঙে পড়ি কান্নায়।

কত না কথা ঝঙ্কার দেয়
দোলা দেয় মনে,
একবার ফিরে এসো মা
কামনা করি তোমায় মনে প্রাণে।

একবার শুধু দেখতে চাই মা
তোমার সেই মায়া মাখা মুখ,
যে মুখ দেখে ভুলে থাকা যায়
দুনিয়ার শত দুখ।

মা শুধু তোমাকে খুঁজে বেড়াই
তোমার স্মৃতির গন্ধ নিয়ে
আমার এ দুনয়ন হারাই
মা তোমার স্মৃতিগুলো সদাই মনে পড়ে।

নারীর স্বাধীনতা

নাফিসা জামান (জেমিন)
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-A, রোল-১১৮

ছেলে মেয়ে দুইজনকে সমান যোগ্যতায় গড়তে হয়
তা না হলে পরে হীনম্মন্যতায় ভুগতে হয়।
পুরুষশাসিত এই সমাজে
ছেলেদের বেশি শিক্ষিত করা হয়,
শিক্ষার অভাবে মেয়েরা সব
অন্ধকারে পড়ে রয়।

নারী বলে যুগ-যুগ ধরে
চোখ বুঁজে অন্ধের মতো
সব অত্যাচার সইতে হয়।

পুরুষশাসিত এই সমাজের গণ্ডি হতে
নারীরা কি পাবে মুক্তি?
নাকি আজীবন পড়ে রবে
পুরুষের পদতলে হয়ে মাটির মূর্তি?

নারীর জীবনে স্বাধীনতা কি দিবে হাতছানি
নাকি আজীবন নারীর স্বাধীনতা রবে,
শুকপাখির মতো হয়ে পুরুষের দাসী?
না সেদিন হয়েছে আজ বাসি
কর্মগুণে যোগ্যতায় নারীরা হয়েছে আজ মানসী।

ক্রিকেট মানে

মো. সাফায়েতুল ইসলাম আরাফাত
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-I, রোল-৩৭৭

ক্রিকেট মানে আমার প্রিয় খেলা
ক্রিকেট মানে ইমন, মাহমুদুল, আকবরের
ব্যাটে চার-ছয়ের মেলা।
ক্রিকেট মানে সাকিব, শরিফুল, রকিবুলের
উইকেট ভাঙার পালা।
ক্রিকেট মানে
স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাকিবুলের হ্যাটট্রিক করা।
ক্রিকেট মানে,
বাংলাদেশ প্রথম নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠা।
ক্রিকেট মানে,
লক্ষ-কোটি বাঙালির প্রার্থনা।
ক্রিকেট মানে
আকবরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে মহামূল্যবান ৪৩ রান করা।
ক্রিকেট মানে, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে
মাহমুদুল হাসানের জয়ের সেঞ্চুরি করা
মাঠেতে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়া
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে
বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া।

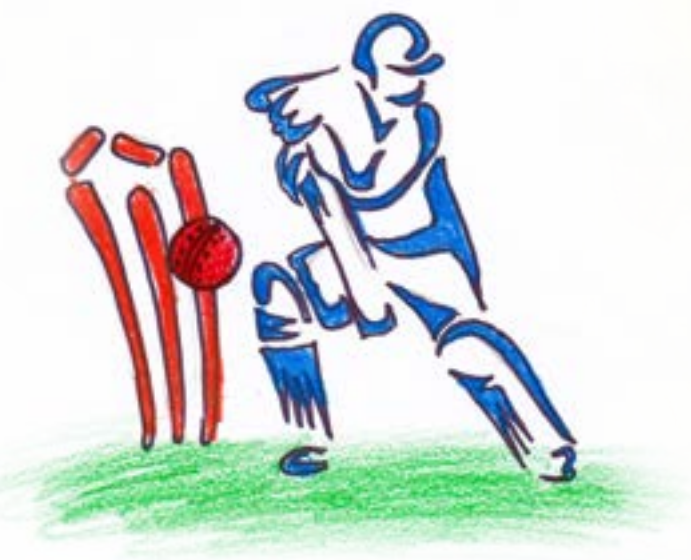

সুসং দুর্গাপুর

কামরুন্নাহার জুলি
শ্রেণি- দ্বাদশ, শাখা-F, রোল-৫৩৫

প্রকৃতির লীলাভূমি
সুসং দুর্গাপুর
ময়মনসিংহ থেকে কাছেই আবার,
ঢাকা থেকে অল্প খানিক দূর।
ছায়াময়ী মায়াময়ী
এই দুর্গাপুর।
আসলে তুমি দুর্গাপুরে
যেও ভাই রানিখং আর বিজয়পুরে।
কাছে যে তার আপন মনে
বইছে সুমেশ্বরী,
তারই পাড়ে আছে আমার
ছোট্ট একখান বাড়ি।

বাড়ি তো নয় স্বর্গ নেহাত
ভরে যায় মন প্রাণ
প্রকৃতি মায়ের সৌন্দর্য যেনো
তাতে করেছে দান।
আমার বাড়ি আসলে তুমি
দেবো তোমায় বালিশ,
ঘুমানোর নয়-যে ওটা
মিষ্টি একখান জিনিস।
এসব কিছু ঘিরে আছে
আমাদের নেত্রকোণা,
সত্যি এটি মন ভুলানো
নয় যে জাদু টোনা।
সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে
এসেছে যারা ছুটে,
দুর্গাপুর চিরদিন রবে
তাদের হৃদয় কোঠোরে।

চেতনায় বাংলা

মো. শাহাদাত হোসেন সিয়াম
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-J, রোল-৫৩১

চেতনায় সে এক রূপসী নারীর ছোঁয়া
কে তুমি হৃদয়স্পর্শী?
যার দেহ জুড়ে রয়েছে অস্ফুট ধানের গন্ধ
কী যেন এক আহামরি;

যার হাতে রয়েছে পলাশ ফুলের কাকনবালা
পায়ে রয়েছে দূর্বা ঘাসের নূপুর
যার মন জুড়ে রয়েছে শান্তির ছায়া
নিঃশ্বাসে আছে মন জুড়ানো এক সুর;

আর এ এতো আমার হলুদ শাড়ি পড়া বাংলা
যার ফুলে প্রজাতির খেলা

যার নদীতে রয়েছে পাল তোলা নৌকা
যেখানে রাখালের মোহন বাঁশির সুর

হ্যাঁ তার প্রেমে পরা আমি এক মত্ত প্রেমিক
যে প্রেমের জন্য প্রাণ দিতে সদা নির্ভীক

ভালোবাসি তোমায় বাংলা চেতনায় শুধু তুমি
হাজার বছর থাকব তোমার বুকে এ মোর হৃদয়ের মিনতি।

সুন্দর প্রকৃতি

রাকিবুন নাহার (ইফা)
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-B, রোল-১৩৫

ঐ সুদূর আকাশ পরে
মেঘ বিজলী খেলছে খেলা,
হারিয়ে দিয়ে আপনারে এই
স্তব্ধ বিকেল বেলা।
ঐ যে আকাশ অনেক বড়
ইচ্ছে করে পাখি হয়ে উড়ি,
মনের সুখে ডানা মেলে
দেশ বিদেশে ঘুরি।

শুক, শালিক, আর পিউ পাপিয়া
মনের সুখে মেলে ডানা,
ভোর বিহানে রবির সাথে
গান গেয়ে যায় বনের সাথে,
ঐ যে দেখ ঝরনার বাহার
চারপাশ বয়ে যায়।
হেলে দুলে পাহাড়ের সাথে,
মিতালি করতে চায়।
চরণে তার মুক্ত নূপুরে
ধূলাবালি মাখা তাতে,
বিজলীর শিখা যেন,
মধুপূর্ণিমার রাতে।
আকাশ পানে দেখি,
পাহাড় চূড়ায় খুঁজি।
রাতের তারার মাঝে,
মেঘের ছায়ার ভাঁজে,
পেয়েছি তোমারে সুন্দর প্রকৃতি।

করোনায় সতর্কতা

মাস্ক ব্যবহার করুন,
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।
করোনা রুখে দাঁড়ান।

বাবা মাস্ক
পরে যাও

Office
Mask ছাড়া
স্যার মাস্ক ছাড়া
প্রবেশ নিষেধ

জান বাইরে
বেশির ভাগ মানুষ
মাস্ক পরে না
তুমি পড়বে।
তুমি সুস্থ থাকলে,
আমরা
সুস্থ থাকবো

এসো হাত
ভালো করে ধুই

একটু পর পর
সাবান দিয়ে ভালো
করে হাত ধুই
SOAP

জানা অজানা

মানবদেহের অজানা তথ্যাবলি

মো. আবরার আজিম
শ্রেণি-৮ম, শাখা-ক, রোল-২৫

- ৬৫ কেজি ওজনের একজন মানুষের শরীরে যে পরিমাণ চর্বি থাকে তা দিয়ে ৭টি সাবান ও ৭৬টি মোমবাতি তৈরি করা যাবে।
- মানুষের শরীরে যে পরিমাণ আয়রন থাকে তা দিয়ে দুই ইঞ্চি মাপের একটি পেরেক তৈরি করা যাবে।
- একজন মানুষের শরীরে যে পরিমাণ ফসফরাস থাকে তা দিয়ে ২২০০টি দিয়াশলাইয়ের কাঠি তৈরি করা যাবে।
- মানবদেহে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে তা দিয়ে ২৫ ওয়াটের বাল্ব ১০ মিনিট জ্বালানো যাবে।
- দেহের লিভার বছরে যে পরিমাণ রক্ত ফিল্টার করে তা ৫০ বালতি দুধের সমান।
- মানবদেহের হৃদপিণ্ড প্রতিদিন ৭৫০০ লিটার রক্ত পাম্প করে।
- মানুষ প্রতি রাতে ২ ঘণ্টা স্বপ্ন দেখে।
- মানুষের হাঁচির গতিবেগ ৮০০০ কিমি/ঘণ্টা। এর সাথে ৬ কোটি ভাইরাস বের হয়।
- একজন মানুষ সারা জীবন যে খাদ্য খায় তার পরিমাণ ৩০,০০০ কেজি।
- মে মাসে জন্মগ্রহণকারী শিশু অন্যান্য মাসে জন্মগ্রহণকারী শিশুর তুলনায় ২০০ গ্রাম বেশি ওজনের হয়।
- একজন মানুষের নাক দিয়ে গড়ে রোজ ১৫ কিউবিক মিটার বাতাস ফুসফুসে যায়।
- একটি মানব দেহের লোহিত কণিকাগুলো পর পর সাজালে ৩০৬৫ বর্গমিটার জায়গা দখল করবে।
- একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের ওজন ৩০০ গ্রাম।

সংগৃহীত

জানার আছে অনেক কিছু

তাউসিফ আল নূর
শ্রেণি-৯ম, শাখা-ক, রোল-২১৭

» বিশ্বের কোন শহরটি দুই মহাদেশে অবস্থিত?

> উত্তর-ইস্তাম্বুল (তুরস্ক)।

» বিশ্বের কোন দেশে মোট জনসংখ্যার সবাই পুরুষ?

> উত্তর-ভ্যাটিকান সিটি।

» কোন মহাদেশের দেশগুলোর সীমারেখা জ্যামিতিকভাবে বিভক্ত?

> উত্তর- আফ্রিকা মহাদেশের।

» পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপের (তিনদিকে জল, একদিকে স্থল) নাম কী?

> উত্তর- আরব উপদ্বীপ।

» বিশ্বের সর্বোচ্চ বৃক্ষের নাম কী?

> উত্তর- রেডউড।

» পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম পাখির নাম কী?

> উত্তর- হামিংবার্ড।

» চায়ের কোন উপাদান শরীরের কোনো উপকারে আসে না?

> উত্তর- ট্যানিন।

» বাংলাদেশের কোন জেলার সাথে দুইদেশের সীমান্ত রয়েছে?

> উত্তর- রাঙামাটি।

» সর্বকনিষ্ঠ খেতাবধারী বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম কী?

> উত্তর- শহীদুল ইসলাম, বীর প্রতীক (১২ বছর)।

» 'বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ' গ্রন্থের লেখক কে?

> উত্তর-রামেন্দু মজুমদার।

» স্বেচ্ছায় নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখানকারী ব্যক্তি কতজন এবং কে কে?

> উত্তর-০২ জন। ফ্রান্সের জন পল সার্ত্রে এবং ভিয়েতনামের লি ডাক থো।

» বিশ্বকাপ ফুটবলে দ্রুততম গোলদাতা কে?

> উত্তর- হাসান সুকুর (তুরস্ক), ১১ সেকেণ্ডে।

গল্প পড়ি সচেতন হই

হোমায়রা তাবাস্‌সুম সাউদা
শ্রেণি-১০ম, শাখা-চ, রোল-২২১

এক ভদ্রলোকের গাড়ি পার্কিং থেকে চুরি হয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও গাড়ির হদিস পেলেন না। তবে পরের দিন হারানো গাড়িটাকে আগের জায়গায় দেখে তিনি অবাক। হারানো বাহন ফিরে পেয়ে ভীষণ আনন্দিত হয়ে দৌড়ে গাড়ির কাছে গেলেন। ড্রাইভিং সিটে একটা মুখবন্ধ খাম। খুলে দেখলেন ভেতরে দেওয়া চিরকুটে লেখা, "মায়ের শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ায় হাসপাতালে নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু একে তো রাত, তার ওপর কোনো গাড়ি না পাওয়ায় আপনার গাড়ি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলাম। বিনীত ভঙ্গিতে আরো লেখা রয়েছে, "আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখিত। গাড়িতে যত পেট্রল ছিল, সব আগের মতোই আছে। তা ছাড়া আপনার গাড়ির খারাপ তালাটাও ঠিক করে দিয়েছি। গাড়ি ব্যবহারের বিনিময়ে আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য ১০টা সিনেমার টিকিট দিলাম। এই চিঠির খামের মধ্যেই সেগুলো পাবেন। টিকিটগুলো আগামীকালের, নাইট শোর। আমি জানি, আপনার বাসার কাজের মেয়েসহ আপনারা ১০ জন। আপনাদের খাবারের জন্য রাখা আছে সিনেমা হলের ফুড কোর্টের ভাউচারও (বিল পরিশোধিত)। সিনেমা দেখার পর যা ইচ্ছা খেয়ে নেবেন। সব শেষে আবারো বিনীত অনুরোধ, আমার অনন্যোপায় অপরাধের জন্য ক্ষমা করে দেবেন।

১৫ লাখ টাকা দামী গাড়িটা ফেরত পাওয়ায় পরিবারের সবাই ভীষণ খুশি। পরদিন উপহার পাওয়া টিকিট নিয়ে চলে গেল সবাই সিনেমা দেখতে। ছবি দেখা শেষ করে মনের মতো স্পেশাল চিকেন-রাইস-কফি-আইসক্রিম খেয়ে বের হল সবাই; কিন্তু গাড়ি তো নেই পার্কিংয়ে।

আবারো চুরি হলো গাড়িটা? উপায় না পেয়ে ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি ফিরে তারা দেখলো, ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙা। ঘরের সব দামি জিনিস, আসবাবপত্র, নগদ টাকা, গয়না চুরি হয়ে গেছে। ক্ষতি প্রায় কোটি টাকা। বাইরে টেবিলে একটি খাম পড়ে আছে। তাতে লেখা, "সিনেমা কেমন দেখলেন? গাড়িটা আবার চুরি করে নিয়ে গেলাম। আপনি কেন গাড়ির লক আর চাবি বদলাতে ভুলে গেলেন? বাসা একেবারে ফাঁকা রেখে কেউ সিনেমা দেখতে যায়? দেখলেন তো, একটু বোকামির জন্য কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল!"

হাসতে নেই মানা

তাবাসসুম বিনতে আলম
শ্রেণি-৫ম, শাখা-ক, রোল-২৩২

ভাড়া বৃত্তান্ত!

একদিন এক লোক তার ছেলেকে নিয়ে পাবলিক বাসে করে স্কুলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। বাসের কন্ট্রাক্টর এসে ভাড়া চাইল! তখন লোকটি ২০ টাকার ভাড়া ৫ টাকা দিল! বাসের কন্ট্রাক্টর আশ্চর্য হয়ে বলল- আপনি ২০ টাকার ভাড়া ৫ টাকা দিচ্ছেন কেন?

লোকটি উত্তরে বলল- আমার ছেলে স্টুডেন্ট! তার ভাড়া হাফ! আর আমি স্টুডেন্টের বাপ! আমার ভাড়া মাফ!

কলার দাম এক টাকা

রাজা মিয়া বড়ই কৃপণ। একবার তিনি গেছেন কলা কিনতে-

রাজা মিয়া: কী ভাই, এই ছোট্ট কলাটার দাম কত?

বিক্রেতা: তিন টাকা।

রাজা মিয়া: দুই টাকায় দেবে কি না বল?

বিক্রেতা: বলেন কী! কলার ছোকলার দামই তো দুই টাকা।

রাজা মিয়া: এই নাও এক টাকা। ছোকলা রেখে আমাকে কলাটা দাও।

অন্ধ ভিক্ষুক চেনার উপায়

এক অন্ধ ভিক্ষুক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছে। এক পথিক দাঁড়িয়ে বলল-

পথিক: এই যে, তুমি যে ভিক্ষা চাইছো, কীভাবে বুঝবো যে তুমি অন্ধ?

ভিক্ষুক: ঐ যে দূরে একটা গরু দেখতাছেন, ওইটা কিন্তু আমি দেখতে পাইতাছি না।

জ্যাম আর জেলির পার্থক্য

স্কুলের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী দেরি করে আসে। তাই একদিন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক জানতে চাইলেন-

শিক্ষক: গাড়ির ভিড়ে রাস্তা আটকে যাওয়াকে কী বলে?

শিক্ষার্থী: জ্যাম।

শিক্ষক: আর রাস্তা পরিষ্কার থাকলে?

শিক্ষার্থী: অ্যা... ইয়ে... বোধ হয় জেলি, স্যার।

ধাঁধা

শাহরিয়ার নাফিজ সাদ
শ্রেণি-৫ম, শাখা-খ, রোল-১০৩

১। ছোটো ছোটো পাতা, চিকন চিকন ডাল, ফলটি বাঁকা কিন্তু বিচিটি লাল। এটা কী?

২। ছাল খাই না বাকল খাই না, খাই শুধু পানি, গ্রীষ্মকালে খেতে মজা আমরা সবাই জানি। এটা কী?

৩। আমার আছে তোমার নেই, আপার আছে বাবার নেই। এটা কী?

৪। এমন এক বিহঙ্গ ভাই দুই বর্ণে হয়, উল্টিয়ে পড়লেও একই নাম রয়? এটা কী?

আফরা ফারহিন হক
শ্রেণি-৫ম, শাখা-ঘ, রোল-১৯৪

৬। আম নয়, জাম নয়, গাছে নাহি ফলে, তবু সবাই তারে ডাকে ফল বলে।

৭। ইংরেজিতে বাদ্য

বাংলায় খাদ্য

কিবা সেই ফল

চট করে বল?

৮। ধাঁধা: শুঁড় দিয়ে কাজ করি, নই আমি হাতি।

পরহিতে খাটি সদা, তবু খাই লাথি।

ধাঁধার উত্তর ১২৬ পৃষ্ঠায়

আনিকা ইসলাম
শ্রেণি-কেজি, শাখা-ঘ, রোল-৮৪

৯। চার বর্ণে নাম হলে, হয় বিদেশি ভাষা, দ্বিতীয় বর্ণ বাদ দিলে জলে তার বাসা। বল, ভাষা ও প্রাণীটির নাম কী?

১০। দিনে ঘুমায় রাতে জাগে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় মাটিতে পা না রেখে। বল, জিনিসটি কী?

১১। কী এমন জিনিস যা এক কোনায় বসে সারা বিশ্ব বেড়ায় ঘুরে?

১২। কী এমন জিনিস যা শব্দ হলেই ভেঙে যায়?

১৩। দেশ থেকে যাও দেশান্তরে নেই খরচের ভয়। যতই ঘোরাও নেইকো মানা খেললে খেলা নয়?

জান্নাতুল তাজরি সারনি
শ্রেণি-কেজি, শাখা-গ, রোল-০৬

১৪। একলা তারে যায় না দেখা সঙ্গী হলে বাঁচে। আঁধার দেখে ভয়ে পালায়, আলোয় ফিরে আসে।

১৫। কাঁধে আসে, কাঁধে যায় বিনা দোষে মার খায়।

১৬। এমন এক জিনিসের নাম বল খেলে পেট ভরে না কোনো কালে, তবুও যে খায় সকলে। এটা কী?

তাহিরা রহমান
শ্রেণি-৫ম, শাখা-খ, রোল-১৪২

১৭। তিনজন মহিলা এক সাথে রাস্তায় হাঁটছিল। একজন লোক এসে তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা সম্পর্কে কী লাগেন?" আরেক জন এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের শাড়ির দাম কত?" এই তিনজন মহিলা এক কথায় দুইজনের উত্তর দিল। উত্তরটি কী হবে?

১৮। বাটির মতো ছোট একটা জিনিস, তার মধ্যে সমুদ্রের পানি ঢেলে দিলেও জিনিসটা ভর্তি হয় না। বলতো কী?

১৯। দেহ আছে প্রাণ নেই
সে এক রাজা সৈন্য সব আছে তার
নেই তার প্রজা।
বলতো কী?

ধাঁধার উত্তর

১। তেঁতুল, ২। আখ, ৩। 'আ', ৪। ঘুঘু, ৬। পরীক্ষার ফল, ৭। বেল, ৮। ঢেঁকি, ৯। ইংলিশ ও ইলিশ, ১০। চাঁদ, ১১। টিভি, ১২। নিরবতা, ১৩। গ্লোব, ১৪। ছায়া, ১৫। ঢোল, ১৬। আছাড়, ১৭। তিন সতীন, ১৮। ছাকনি, ১৯। দাবার গুটি

শিক্ষক

চিন্তার কিছু নেই, তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন খুব সহজ হবে

প্রশ্ন

নিচের কোনটা সবুজ

১. নীল ২. সবুজ

কৌতুক

নাদিম আল মাহমুদ
শ্রেণি-৭ম, শাখা-ঙ, রোল-৮৫

প্রাচীনতম প্রাণী

শিক্ষক : বলতো সবচেয়ে প্রাচীনতম প্রাণীর নাম কী?

ছাত্র : জেব্রা।

শিক্ষক : কেন! জেব্রা কেন হবে?

ছাত্র : কারণ প্রাচীনকালে সব সাদা কালো ছিল। এখন সব রঙিন হয়ে গেছে। কিন্তু জেব্রা এমন একটা প্রাণী যা এখনও সাদা কালোই আছে।

চোখের সমস্যা

শিক্ষক : বলতো কী খেলে চোখের সমস্যা হয় না?

ছাত্র : ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদি খেলে।

শিক্ষক : আরে গাধা! এতদিনে এই শিখেছিস?

ছাত্র : স্যার, আমি তো ঠিকই বললাম। আপনি কখনো দেখেছেন গরু-ছাগলরা চোখের সমস্যার জন্য চশমা পড়ে? কারণ তারা লতা, পাতা, ঘাস এসব খায়।

তারান্নুম বিনতে আলম
শ্রেণি-৫ম, শাখা-ক, রোল-২৪৪

চাপাবাজ রিক্সাওয়ালা

এক ভদ্রলোক শাপলা চত্বর থেকে দৈনিক বাংলা মোড় যাবেন। রিক্সাওয়ালাকে ডেকে বললো, 'মামা, যাবেন?'

রিক্সাওয়ালা বললো, 'যাবো।'

-ভাড়া কত? -৫০ টাকা।

কী কও মিয়া? এখান থেকে দাঁড়িয়েই দৈনিক বাংলা মোড় দেখা যায়। তার ভাড়া এতো?

রিক্সাওয়ালা তখন বললো, এখান থেকে তো চাঁদও দেখা যায়। আপনাকে আমি পাঁচশ টাকা দিবো। আমাকে চাঁদের দেশে নিয়ে যাবেন?

নিউটনের চতুর্থ সূত্র

তুমি যদি ভোর ৬ টায় অতিরিক্ত ৫ মিনিট ঘুমানোর জন্য চোখ বন্ধ করো, চোখ খুলে দেখবে যে ৭.৪৫ বাজে কিন্তু যদি ক্লাসে বসে বোরিং লেকচার শুনতে শুনতে ১২.৩০ মিনিটে ৫ মিনিটের জন্যে চোখ বন্ধ করো, চোখ খুলে দেখবে ১২.৩১ বাজে।

লামিছা লাবিব লব্ধ
শ্রেণি-৩য়, শাখা- খ, রোল-৯১

বাংলা ক্লাসে স্যার করিমকে বললো:

স্যার : করিম, বলো তো ভাতের অভাবকে কী বলে?

করিম : পারি না স্যার।

স্যার : আরে বোকা, ভাতের অভাব হলো হাভাত।

কিছুদিন পর বিজ্ঞান ক্লাসে স্যার করিমকে প্রশ্ন করলো :

স্যার : বলো তো করিম, পানির অভাবকে কী বলে?

করিম : হাঁপানি।

ENGLISH CORNER

How they viewed life **129**
Reality Behind Mask **131**
Virtual Education **134**
Parents Should be Careful to Take Care of their Children **135**
Digital Vulnerability **137**
CPSCM: My Inspiration **139**
Quantum Computer **140**
A Forgotten Educationist : The Pioneer in Female Education **142**
The Famous Places of Kishoreganj **144**
Marriage Can Wait, Education Cannot **145**
146 Say 'No' to Plastic Bags!
147 The Planets of the Solar System
148 A Departed Soul
149 A Strange Experience
150 An Immortal Soul of the Land
151 Pursuing Happiness
151 Dream in Life
152 Don't Make a Promise
152 My Mother Land
153 When We'll Be Dead
153 Life is Precious
154 Jokes

HOW THEY VIEWED LIFE

Lt Col Md Nazib Mahmud Shajib, psc, G
Principal

Whenever we look towards an extra-ordinary and successful person in life, we tend to forget that they did emerge from ordinary life. Let us analyse a few of those famous quotes emanated from some greats which may lead us to believe in ourselves once again.

" Everybody is a genius; if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid"
-Albert Einstein.

There is no problem if the world is judging the person with unclear judgement benchmark, where the competition or comparison is in a clear uneven field, the person(s) judging will be proved to be stupid but not you. But if you (the fish) itself believes that since I cannot climb a tree basing a belief that I should have climbed it, then undoubtedly it is stupid. Every individual has its genuine ability, i.e., Sakib Al Hasan is a bowling Allrounder, Albert Einstein is a scientist. Now, if we give bat in Einstine's hand and wait for a six to be hit in nail-biting finish match, then people will say nothing but laugh. Albert Einstein did what he could do best, which was his forte and natural strength but not swim; on the other hand, the fish having the natural ability to swim can best swim anywhere in the world, be it a pond, river, or sea. Rest assured, if a person who doesn't know how to swim will be mesmerised, having a look at the swimming fish, with its natural expertise of different types of swimming. Freestyle stroke, backstroke, breaststroke, butterfly stroke, and sidestroke might take ages to learn by a genuine swimmer even, but it will not overshadow the effortless styles of a born swimmer like fish. Thus, we must find out own character type and act on its basis, only then the sky is the limit, and we all are genius.

"Education is not the learning of facts but the training of the mind to think"
-Albert Einstein.

As of now, if we talk about the facts or knowledge database which is available on the fingertips, just a click of the mouse button away, then Google will do the rest. Conversely, if we go to the school to memorise those data which can be retrieved on being asked in the exam hall, then there is no difference in a student's brain or a storage device like a computer server(maybe worldwide web base). If we try to feed all possible facts/knowledge in our brain just like copy-paste, we surely will lag far behind than the latest internet storage database. So we cannot call it straightaway an education system as it copies data to the brain. However, if we go by the training of the mind to think, then we get a real scenario because knowledge without being processed to its users to find a solution is – 'no knowledge'. Data(what we collect/memorise directly from the book) is a raw and unorganised fact that is required to be processed to make it meaningful. In contrast, information (processed data) is served in a meaningful way according to the given requirement. Therefore, real education is all about training a person's mind to think and analyse the problem basing its facts or data as per their intelligence level.

"When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favour"
-Elon Musk

You get an example by putting yourself in the subject. What is the most important thing that as a student you must do, the answer is – 'study'. Three things/ events may drive you; firstly, you have the real enough need for study: some students may not feel, and some may think that he/she is richer

enough not to study as they can sit tight and run whole life of their parents' income. In both cases, you have a real need, meaning to say, the study is important enough, but you don't get convinced. A study is an important tool for both types of students since none can guarantee the future income source; therefore, anytime you may need a great amount of income source rather than keeping it stagnant. In a completely competitive world, nothing is indispensable, not even your guardian/well-wishers' capability. **Secondly**, you got a purpose that is driving you, in this case, a real parent-child relationship will drive you as they always love you to see getting an A+ grading in all exams- so you study for them. And **Lastly**, you study for others where you show a gem of expertise to grab the attention of others by contributing to the nation. The odds will always not be in your favour, but who cares when you have a real good reason to do something important; do it (study I mean!).

Now, few own words: Student's life is full of potentials. The dots they are connecting is the path they are creating, and from a few years from now as looking back can certainly check what pictures of their life they painted by their own hands. These pictures were seemingly some dots at their school/college life. By creating a vision of where a student wants to see themselves at the career, is by far the best strategy. In doing so, they must set study as the only means by which they can reach their goal. They may paste some pictures of their future self in their 'vision board' which is tangible/touchable reality. More often than not, the students are prone to distracting their core path of study by divulging in social media, wasting time in unproductive thoughts/actions/gossips. The reasons behind are not that they all want to, but in some cases, the peer-pressure leads to, or they keep forgetting the core vision(roadmap to ultimate end state) or they didn't have any. When an individual knows the need for surity; they won't go for the want. A healthy lifestyle is the most important asset that a student can buy at their age; it leads to exciting life now and in future. A sick man cannot study, let alone enjoy all their achievements in due course of time even. Having a healthy lifestyle includes a balanced diet plan, an exercise in the form of play/sports/ swimming etc. happy mental health corresponding the near ones and personal growth in terms of skill development. Rewarding oneself (some small things that you crave for) is the most intelligent way to fool the brain in studying and letting in achieving in the form that it wants. Brain does remember the tune, normally when you read to memorise it gets due attention if you read it out loud and harmoniously. As a result, our brain also does get tuned up in a style which is engaging and cannot get diverted. Yet, making your mind strong and focused enough will lead you to study silently. Writing more and more gives you a chronic practical experience of the exam and familiarise yourself with the system. At the same time, it works as an image/pattern remembering technique, which you might know, is the way the brain works to remember something. For Example , if one of your friend lives in 'Kathalbagh' area imagine him standing inside a 'Jackfruit' garden. However, every little technique will get some time to be accustomed to.

I wish best of luck for all my beloved students. Happy learning.

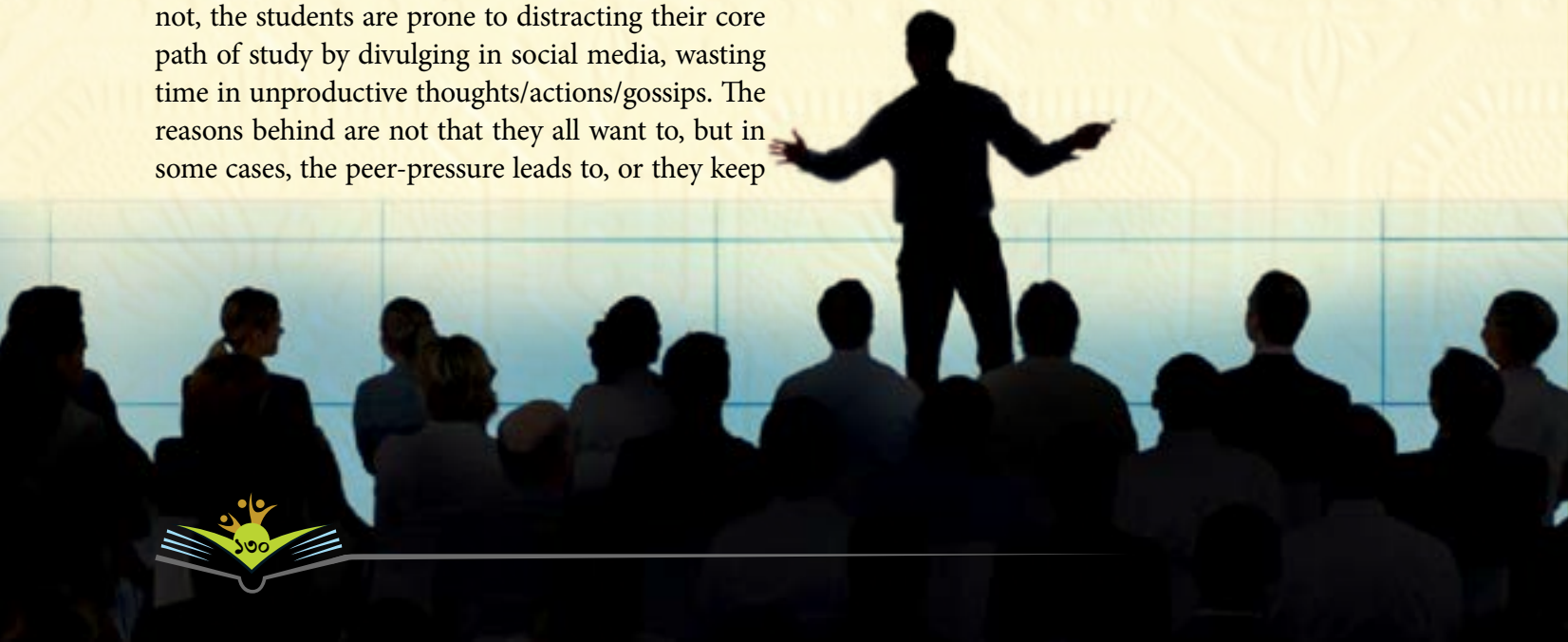

REALITY BEHIND MASK

Md. Tarikul Ghani
Lecturer, English

We can see the things that are visible, that we find before our eyes, that we can feel the existence with the touch of our senses and naturally we start to believe that things are true; we start to consider that things are real. From this point of view, we find philosophers to say 'Seeing is Believing'. Some may have contradiction on this view point of philosophers. They may say God is invisible and we cannot see Him through our eyes. Nevertheless, we have complete belief on the existence of God. This view of believers is not wrong because apparently people find the existence of God invisible or unseen. So their view contradicts with the view of philosophers. But I don't feel any contradiction with the philosophers. Actually, can't we feel the existence of God? Don't we find the existence of God? Of course we can feel the existence of God. If we want to feel or if we want to see the existence of God we must have pantheistic view. Every living being is born once; every living being dies again; the air blows; the leaves of trees move. How all these things are done? Definitely there is something behind all these things. Definitely some power functions behind them. The 'Causality Principle' states that all real events necessarily have a cause. The principle indicates the existence of a logical relationship between two events, the cause and the effect, and an order between them: the cause always precedes the effect. If we have our inner eyes, we can discover Him everywhere. We can feel a power behind everything and that is nothing but the existence of God. So philosophers' saying 'seeing is believing' is completely true because the existence of God can be seen in our own existence. This saying has got large explanation or deep inner meaning. With limited knowledge of philosophy it is not possible to explain it. And so today I will raise my point-finger towards another point of view and prove this speech wrong. I will try to show-some visible reality is not always believable.

After getting birth a beast gets only beastiality in itself but a human being gets both beastiality and humanity in himself. In other words it can be explained that a human being is the combination of 'goodness' and 'ugliness'. Both these qualities lie simultaneously hidden in the core of heart. As human beings are the greatest creation of God, He has given us one exceptional thing- conscience. This conscience dictates a man to follow either of these two qualities. A beast is found always with its appearance of a beast, with the quality of beastiality in its heart. But a human being is always found with a human appearance whether he/she nurtures humanity or bestiality in him. It means, even a follower of ugliness does not get the appearance of beast or ugliness. We can see only 'goodness' exists in the face of all human beings. Even some people adore themselves more with the feathers of the rituals of different religions hiding their bestiality in mind. Especially some followers of Islam have the disguise easily in their face. They do it in two ways. Firstly they bring an adornment in their face with some external (natural or artificial) mark and secondly they pronounce honey mixed words quoting from Islamic books. They can easily do it because the holy Quran is not only a religious book but a complete code of life for all the people of the universe. Without following the actual teachings of Quran, they follow some rituals of Islam and want to establish with an appearance of perfect human being. For doing it, they themselves consider to be good, the society considers them to be good, everyone around him considers them to be the followers of strict principles. Nothing goes wrong with the belief as we all are religious minded, as

we know that the holy Quran is the complete code of life. But is it a right assumption of people or deception of those followers with a glittering adornment of Islam in their face?

It is Islam which is more than a religion; it is not only a faith but more than that; it is Islam not limited only in some rituals, rather it is a philosophy; it is not only some verses for the sake of verses but a complete code of life. This holy book cannot be limited within a group of people because it shows the people of the whole universe the path how to nurture goodness. The main teaching of this great holy book is to lead a life with ethical values, morality, honesty. The teaching of Islam is to make a man humane, to make a man logical, to make a man rational, to endow a man with ethical values, to shower a man with the blessings of tolerance, patience, nobility, humanity, to help a man to fulfill the commitments to the society, to his fellow beings, to the nation. Islam gives a man the teaching to leave hatred, vindictive attitude, greed, envy and all the negative attitude subversive to the common interest of humanity. Islam is known as the religion of humanity. The vastness of Islam cannot be limited only within some rituals. It will debase the essence of Islam. Wearing the feather of Islamic rituals, some people forget the basic principles of Quran and hide the reality behind a mask. I am not against observing religious orders or the rituals. I am against feigning. I object if someone wears only the feathers of the rituals without cultivating actual teaching of Islam in mind. They speak boastfully and pronounce highly at the top of their voice to have the pride of having ethical values because they are the followers of Islam; they are observing rituals perfectly. They think that they have got heavenly spot on their forehead for maintaining religious orders. They are doing it five times a day or one fifty times a month and considering themselves to be the owners of the key of heaven. As they have got heaven in their pocket and have earned heavenly quality, they think that they are the owners of all kinds of principles and goodness. But in reality they are lying, showing vindictive attitude, ironically doing things against what they are saying and above all dishonoring the actual values of Islam. They are limiting the unlimited vastness of Islam. Seeing the goodness of those people, their fellow beings also consider them to be the men of strong ethics and honesty. Isn't a deception to the innocent feelings of common people?

We are living in a masked world. All living beings come to the world just only with his naked body. Just after the birth of a human child, it necessitates a new cloth. Its body is wrapped with a piece of cloth. It seems that, just after the birth, a human being is covering his ugly, naked reality behind a mask. On the other hand, a beast gives birth to an offspring which does not need any cloths to cover his naked body. It seems it does not feign. It shows its beastiality without hiding the reality. Some people keep their ugliness or brutality hidden and sometimes expose it by unmasking hidden ugliness. When they are in power, in an instance, they bury all the principles that they feigned to have through out his life. At the same time there are some people who possess real goodness. They maintain it even if in tough time of their life. In Shakespeare's 'Measure for Measure' Angelo is a good person with strict moral principle. He knows himself as a good one; all around him also know that he is a man of good character. When he takes the charge of Duke, he revives the law of death penalty for lechery. He gives death sentence to Claudio for illicit relationship with a girl and declares that the law would go according to its own way. Claudio's sister, Isabella, pleads mercy again and again for her brother. Initially, Angelo refuses but on one point he becomes agreed. He suggests Isabella to make an illicit relationship with him for one night. The crime for which he has given Claudio death penalty, now he himself wants to do that. What an irony for him? Angelo surrenders his ethical values in exchange of trifle worldly momentary pleasure. In an instance he has unmasked the mask of his seeing goodness that he was wearing for years. On the other hand Isabella does not want to surrender her chastity even in exchange of the life of her beloved brother. The values that she possesses

in herself is real. The seeing goodness becomes shattered just like a thin piece of glass with the touch of trivial materialistic demand.

Nothing can teach or no training can train one to be good. External training or religious teaching can function a little in this respect if the receiver does not have the mindset to receive it. I agree that we need religious teaching to regulate our lives. But, prior to taking the teaching of Islam we must nurture the goodness in ourselves. Religious teaching can make someone good only when he or she moves according to the direction of his conscience to the path of goodness. God has given us the conscience and the freedom to choose either of this two and maintain it in ourselves. We can easily understand whether we have chosen the real goodness or seeing goodness. In a Sonnet Shakespeare says,

"..... Love is not love

Which alters when it alteration finds

Or bends with the remover to remove."

As we know real love does not change, real goodness can be compromised in no way. Real goodness springs from the core of heart, from the basic principle of a human being. It is as strong and steady as rock; it is as high as mountain. It does not alter or no external force can remove it from heart. If this alteration is done in the face of trifle worldly necessity, it is definitely a masked goodness or seeing goodness and it becomes unbelievable when the mask is unmasked with the touch of materialistic necessity.

VIRTUAL EDUCATION

Sabina Ferdousi
Lecturer, English

In the serene atmosphere of morning after attending assembly activities, students enter the class, exchange greeting, get prepared for the class. As soon as the teacher enters the class, the students show norm standing up. Enquiring of the students' sound health, the teacher starts an interactive class lesson. This is the picture of a traditional class room. But the covid-19 Pandemic has pushed us to re-think about education system. As the virus continues to spread, alternative measures are being taken to prevent coronavirus' aggression. In these couple months of isolation, many schools and colleges have been moved online. What was deemed as the ultimate dream: sitting at home and getting all facilities of education, is really starting to operate even on the very best. Virtual teaching is replacing classroom teaching.

Although moral teaching, socialization, sharing, caring, large play ground – all these vital ingredients to prepare a complete human being are absent in virtual learning, in present situation its popularity is in surge. And zoom as a remote workplace and video calling apps, has added a glamorous attire to virtual education system. Zoom app can accommodate 100 students with the time limitation of 40 minutes.

Virtual learning can produce significant results by improving performance. Researchers found that students involved in video communication are more motivated and interested in the topic and are reported to have high level of achievement in critical thinking and problem solving compared to students physically present in the class room. Zoom on line class is breaking down the invisible walls of learning communities, allowing students to access educators in ways not possible before. It offers access to increased educational resources, flexibility for the learners, equal opportunities for students and teachers regardless of location. Above all, it is ensuring a healthy atmosphere for the learners, maintaining social distance and avoiding time killing for arriving the institute.

However, online learning is to be made more accessible and engaging. Obviously zoom online class is a supplement to class room activities, with everybody's participation. Yet, it has not been completely successful as the students are still not accustomed to such a practice. Moreover, on line education is yet not accessible for all students especially those from remote and rural areas with poor connectivity and a lack of proper devices like smart phone, laptop etc. Even, educators who are used to traditional mode of teaching, lack the technical capacity and resources to adapt to this new digital teaching.

Besides, our education system is theory and practice based learning and online platform only allows us the former. Interactive practical class is not possible through online learning. Again, a proper examination system is also necessary to be introduced to make virtual education more effective.

Until all these issues are resolved fully, it is not possible to conduct classes strictly online. But that does not mean we will sit idle. We should immediately start our preparation to reduce the digital lacking as far as possible. Even in a post pandemic world, we must be prepared to continue virtual education besides the classroom education. And the implementation of this blended learning process will help us establish a successful education system.

PARENTS SHOULD BE CAREFUL TO TAKE CARE OF THEIR CHILDREN

Abdul Wahid
Senior Teacher, English

It is said that, parents are the first teachers of a child and house is the first school of the same. So, every parent has a dream that his children, in future, will bring him name and fame. There are hardly any parents who do not expect anything from their children. They are supposed to be the means of all happiness and comfort. But it does not happen without an effort. It's not line you sow a seed and leave it unattended, uncared at the mercy of nature, expecting it to be a grown up plant that will bear you fruits. If you plant a seed, you must care for it, nurture it at its tender age. It needs your loving care and protection from the wild nature. Only then you can expect the plant to give you a suitable fruit. And the same thing happens to our children. They need a proper parental guidance, a secure environment, in order to grow up properly and fulfill our dreams.

After birth, a child remains under the supervision of its parents. Whatever, they acquire and learn, they learn from their parents. Parents must exercise that opportunity to build up their character. Guidance never means that you impose a power of control and restrict your children from his/her freedom. Guiding your children should be a path shower that will lead them to the ultimate goal. But remember, never show them the good path only hiding or trying to hide the wrong paths. Parents should bring up their children by giving the idea of both right and wrong and assist them to choose the right one.

It is needless to mention that all parents love their children without any hesitation. But, that love needs exposure. You should show your love and express it. In return they will learn to love and respect not only their parents but also others. Encouragement is very important for the children to be innovative, positive and creative. If your child destroys a valuable thing and turns it into a creation of his/her own, it is priceless. You have to have patience and don't let them down.

At present, no one can deny the influence of technology and social media like Facebook, Youtube, Twitter etc. Parents should not ban all these for their children. The more you keep your children away from these technological platforms, the more they will feel attracted to these. So, be positive and let them use for educational purposes.

All children are not born with the same level of talent. In schools it is easier to identify which student is weak in mathematics or who has a great talent for science or exceptional creativity in literature. But being only a parent you may, not realize the talent of your children.

And if you are only working parent then it becomes more difficult. So, parents should keep in touch with their outside guides like school, teachers or home tutors to know about the latent talent of their children and have faith in them to help them flourish it through encouragement. In this respect, having faith in their mentor is really important. For example, your child's teacher knows that he/she is really good at creative writing, but very weak in mathematical analysis and wants you to be supportive to expose his/her talent in the field. But as parents, you hope your child to be a doctor by any means. It will certainly lead your child to dilemma and may spoil his/her future. Help your children to be what they want and like.

As it has been mentioned that you connot ignore the influence of technology, use it properly to raise the awareness among your children through this. Let them know how harsh the world might be through social media. Make sure them to know the consequences of choosing a wrong path. Never expect beyond the capacity of your children. Never burden your children with fear, the outcome of which is not unknown to any of us. You should trust your children.

Parents should be friends before being parents. Mother is to love and father is to rebuke-break such conception. Be an idol of such personality that encourages your child to follow without any doubt and fear. Ensure that they fear you not but respect and follow you. Free your children's mind to fly in the sky of hope, prosperity and happiness. Impart moral values in their mind. Teach them to be truthful first. Reward them if they are truthful even if it is in case of confession of any misdeed and see the result, they will be truthful and it will certainly ensure them a right path as there is no alternative of truthfulness which is the root of all good moralities.

DIGITAL VULNERABILITY

Zahangir Alam
Assistant teacher, English

Internet is an essential component for providing current and up to date information. It is beyond dispute that the internet has radicalised the way which man employs in connecting minds with minds. On a certain scale, it also serves as a source of handy knowledge. The medium is replete with vast prospects and has emerged as one of the most essential gadgets for the modern man. Despite the significant advantages, misuse of the internet results in digital danger.

Internet addiction specifies the extreme use of the internet which sequentially causes problems in relationship, health and professional aspects. The information technology revolution of the present era is primarily based on the internet. It has permeated into our lives to such an extent that life without internet seems meaningless. The internet is a worldwide system of interconnected computer network that has revolutionized the information, allowing humans, to gain access to an unlimited amount of information as well as changing the way humans communicate with each other.

Children who own a computer and have privileged online access have an increased risk of involvement in cyberbullying, both as a victim and as a perpetrator. Recent advances in internet networks and smartphones have made it possible for anyone to enjoy internet use and games regardless of time and physical location. The digital vulnerability among children has become widespread. Several studies have established that children and adolescents, in particular, are becoming addicted to playing internet games, as much the same way as adults become addicted to alcohol or drugs or gambling. In this regard, we can mention some dangerous, mental pressure creating games like Blue Whale, PUBG, and Free Fire. Kids who play games online often face peer pressure to play for extended periods of time in order to support the group. They are playing with or to keep their skills sharp. This lack of boundaries can make kids vulnerable to developing video game addiction.

Against the backdrop of endless supplies of banal and nasty entertainments, including those enticing users to violent behaviours, the very computer has emerged as dread in society. The easy availability of adult films and contents have reasons to deeply trouble society's conscious segments. Young and teenage children are becoming inattentive to studies and taking to crimes and senseless violence. Augment of nuclear family, lack of parental vigilance, dependency on house-maids, inadequate playgrounds have led the children to the virtual world. What's most alarming, a section of working mothers in cities leave their children with computers, so that they can remain engrossed in the virtual world while they are away. Children become increasingly accustomed to long periods of time connected to the Internet, disconnecting them from the surrounding world. This can also be disruptive to the development of healthy social relationships and can lead to isolation and victimization.

Internet addiction can also cause real damage to an individual's health like guilt feelings, poor time management, depression, anxiety, hostility, psychosis, social isolation, substance use disorders, just like alcoholism or drug abuse. Excessive internet use can also lead to desk-bound lifestyles, obesity, and poor physical fitness. Further manifestations include carpal tunnel syndrome, dry eyes, back pain, migraine, poor personal

hygiene etc. It also causes changes in the prefrontal region of the brain (the area that is associated with remembering details, attention, planning, and prioritising tasks). This is rather detrimental as it literally grips one's capability to prioritise tasks, work, school assignments, studying, eating, nature breaks, leisure activities, outdoor play, exercise, one's entire life, in short, the screen literally replaces one's life.

It has been observed that the case for Internet addiction is very evident; with increasingly sophisticated infrastructures developing throughout the world, it will certainly emerge as a more prominent issue. The Internet as a tool of addiction is also associated with physical and psychological problems. The excessive usage of gadgets, screens and gaming affect and impact the pleasure centre of the brain. The addictive behaviour triggers the release of dopamine that promotes pleasurable experiences activating the further release of this chemical and the cycle goes on. Over time, more and more of the activity is needed to induce the same pleasurable response, creating dependency and addiction. Behavioural and physical symptoms such as backaches, headaches, neck pains, insomnia, poor nutrition (failing to eat or eating anything in excess to avoid being away from the computer), poor personal hygiene (not brushing, bathing to stay online), and other vision problems are very common in this condition.

The digital vulnerability is not limited to physical and social spheres. Apart from those in the social sector, the medium's abuse has also struck our economy. We can refer to the Bangladesh Bank hest of 2016.

It has become a national imperative to save the country's gullible youths from the devastating impact of digital vulnerability. Policymakers, health professionals including mental health professionals and guardians should be aware of this problem.

CPSCM: MY INSPIRATION

Ashra AnikaTanha
Class : Twelve, Section- F, Roll: 451

This wasn't my dream school or college either. If I was given the choice to select an institution where I wanted to go back in 2014, CPSCM would have been at the bottom of my list or probably not even in it. But that's the tricky thing about fate. No matter what you do you cannot avoid it. And after 6 years of an extraordinary journey with this institution I can say I am glad that I didn't try to fight it back. This is my last academic year here at Cantonment Public School and College, Momenshahi. I only have a few months left in the place which made me realise I was destined for something more than my ordinary self. As my time has nearly come to an end, I look back at all these years and it made me realize that its the magic of this place and its people which turns hundreds of ordinary students like myself into each a shinning star from within. Among hundreds of others success stories written in the bricks of this institution I am fortunate enough to have a brick of my own. Here talent is recognized and potentials are taken care of. I came across some wonderful teachers who taught me that it was ok to lose sometimes but what was not ok was to not learn anything from it. Among these wonderful personalities I came across one person Md. Tarikul Ghani, lecturer, English who introduced me to the fantastic world of the freedom of speech. Through which many of you know me. He is my mentor, my inspiration. He helped grow expertise in the one area where I can be the best.

This institution gave me the courage to do what's right and taught me how to express myself. After years of hardwork and dedication me and my incredible team won the biggest debate title for our institution till date. We won the Inter Cantonment Parliamentary Debate competition 2019 for the very first time. It was my team; the girl who lost the very first debate in her life now holds the title of the best debater among all debaters of 34 Cantonment Public Colleges. It wasn't an easy journey. I have had my share of sand kicked in my face. But I didn't give up. Because that's one thing my teachers taught me, never to give up. And I didn't. They trained me to be the best version of myself. I was taken care of so well that they became my family. I treated me as their own and accepted me whole heartedly. The amount of dedication they put in every sphere startled me.

This is how students are taken care of in this institute. Their dedication has created a perfect environment here to raise talented students. But above all, the teachers here are able to raise good humans, which to me is the biggest achievement for any institution. The positive environment here has helped numerous students to grow out of their shells and thus resulted in those glorious titles we hold in both academic and co-curricular activities. Our students achieved various champions and national awards. Our institution proudly bagged the title of the best institution in Mymensingh in 2016.

"Knowledge is Power" bearing this motto in heart, Cantonment Public School and College Momenshahi (CPSCM) always focuses on flourishing the dormant talent of the youngsters. The successive acquirements of the institute reflect that CPSCM is a home presenting the nation worthy citizens. It's the endless endeavour of all the members of the institute to make it an abode of promising future. In this way this institution has been shaping students for a better future since 1993. This place is my home and its people are my family. And to the young students who are still searching their purpose in life it's my promise to you that you have come to the right place all you need is hardwork and dedication. This was my story here in the place which made me a strong confident person. I believe I created my fate every day I spent here and so can you. This wasn't my dream school but this institution made my dream come true. My leaving this place is only me not being here physically and about my vast family I am created here, I will always carry them in my heart.

QUANTUM COMPUTER

Abu Ali Sakik
Class-XII, Section-A, Roll-30

"Quantum computer is going to be the most important computing technology of this century, which we are really just about one fifth into"

-Robert S. Sutor, Vice president of IBM

Modern computers are getting a huge upgrade. This upgrade is known as Quantum Computing.

Quantum mechanics is a field of physics that studies the behavior of the most basic and smallest parts of our universe at the subatomic level. At this level reality is very complex compared to the reality we experience every day but it is reality. In the quantum world, things happen, things that scientists are just now starting to try and understand. The word quantum computer is a bit misleading because it sounds like a computer and when people think of a computer they think of a phone or a laptop but the truth is that phone and the laptop and even a very powerful supercomputer operate according to the same fundamental rules. But the quantum computer is fundamentally different. Classical or regular computers run on bits. Bits can either be 0 or 1. But if we use quantum bits as data, something interesting happens. The fundamental idea of quantum computer is quantum bits. A quantum bit or a qubit can be a zero, a one, or they can be in an intermediate state. If you measure a qubit the result you get is based on probabilities.

Qubits exploit two key principles of quantum physics and those are superposition and entanglement.

Superposition is a special phenomenon in quantum physics where particles can be in two states at the same time. This allows quantum computers to process far more data than classical computers will ever be able to do and that is the most important advantage of a quantum computer. If a quantum computer has 100 qubits(2n=2100), it will be more powerful for some applications than all the supercomputers on earth combined.

Entanglement is another phenomenon where it brings together several qubits, join them together, and treat the whole thing as one thing. If you have two qubits and you entangle them, then there will be 4 possible states (00,01,10,11), and each time you add a new qubit the amount grows up exponentially.

So how a quantum computer solves a problem? For example, if you have 4 bits and by using it you can represent 16 binary numbers. Binary is a method of representing numbers that have 2 as its base and uses only the digits 0 and 1. Each successive digit represents a power of 2.

0000	0001	0010	0011
0100	0101	0110	0111
1000	1001	1010	1011
1100	1101	1110	1111

The problem is you have to crack a password. The password represents one of these numbers but you don't know which one. If you load them into a classical computer and write a program to find the password it would check each one of these numbers individually even if it finds the correct password before checking all numbers.

Now, what if you use a quantum computer? Instead of putting in these four regular bits, you put in four quantum bits.

0100

4 entangled qubits in superposition

Those four quantum bits will represent all the numbers at the same time (24=16). When you will run the same operation again to find the correct password in a quantum computer, it will give you the correct and wrong passwords at the same time. But still, you don't know which one among them is the correct one. Well, there's an algorithm named" Grover's Algorithm" which sweep away all the wrong/false computational results and produces the correct/true result.

Here is another simple example. To perform a simple calculation like solving a maze, a classical computer would test each possible route one at a time. But a quantum computer would use its entangled quantum states to find the correct route quicker with far fewer calculations.

In a nutshell, quantum computer gets entangle, change the probabilities by collapsing superposition qubits to produce a result simply they can run all possibilities with lesser calculation.

Quantum computers could simulate our universe allowing us to model new molecules we haven't discovered yet and test them to find new materials. These new materials may help to create other breakthroughs in science and engineering never before thought possible from new batteries and energy sources to incredibly effective medicines. Nature and reality itself are a quantum system and it can't be modeled on a classical computer effectively. There're even proposals that quantum computers could predict climate accurately & for the first time accurately model the human brain. The possibilities are endless.

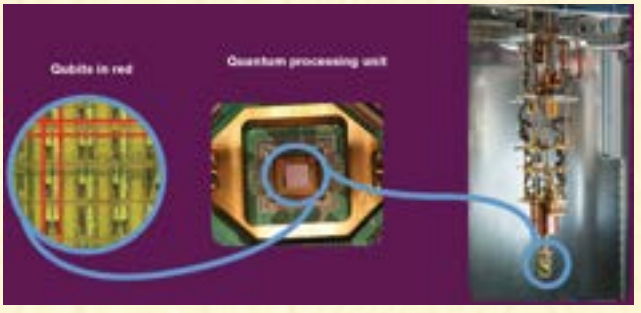

So, what kind of quantum computer does exist in the world today? There're a whole bunch of different companies and universities like IBM, Google, Microsoft, Intel, D-wave, MIT amongst the others are trying to build different kinds of quantum computers. But basically there're two kinds of quantum computers, one is Universal quantum computer which can theoretically simulate any quantum system and the other one is Non-Universal quantum computer which is unable to simulate any quantum system.

If we come back to reality, the quantum computer is at its infancy just like the classical computer was in the 1950s. Back then a classical computer took a whole room and a modern quantum computer is at the same stage. There're still decades of breakthroughs remaining before any quantum computers are capable of creating some serious changes. But the research is still going ahead and people are investing billions of dollars on this project. One thing is very certain that quantum computer holds the potential for a radical change in the progress of humanity just like the steam engine and the internet.

A FORGOTTEN EDUCATIONIST : THE PIONEER IN FEMALE EDUCATION

Syeda Fahada Hamim
Class: X, Section: D, Roll: 10

A very few personalities can be awarded with the honour for dedicating themselves to the extend of education in this Bengal and if it is about female education we rarely mention anyone's name except Begum Rokeya. But in this very region there had been some philanthropists who extended their endeavor in making the women of this land literate and among them Nawab Faizunnesa Chowdhurani is very notable. During the strict time of purdah, many years before the date when Begum Rokeya established her girls school, Nawab Faizunnessa with her daughters Arshadunnessa and Badrunnessa established school for girls with many other educational institutions in the concept that women should walk with men in advance of modernity.

A descendent of the Mughal dynasty, Nawab Faizunnessa Chowdhurani was born in 1834 in Pachimgaon, Lakhsham in Cumilla. She was the first female Nawab in South Asia. Faizunnessa was the daughter of the famous Zamindar parents in Cumilla, Zamindar Ahmed Ali Chowdhury and Arafanessa Chowdhurani. she had two brothers, Yakub Ali Chowdhury and Yusuf Ali Chowdhury and two sisters Latifunessa Chowdhurani and Amirunessa Chowdhury.

Though Faizunnessa was raised in a conservative Muslim family, like all her brothers and sisters, where the women would maintain a strict purdah system, she possessed such a freedom of mind which did not stop her from observing the world around her and asking questions. Unlike the others, Faizunnessa was quite liberal in her thoughts and was not at all superstitious. It was the trend in those days that female children were never sent to schools outside the four walls of their homes. But seeing her keen interest in learning, Faizunnessa's father finally engaged a home tutor for her. In spite of no formal education whatsoever, Faizunnessa had soon become fluent in Bangla, Arabic, Persian and Sanskrit. Her marriage to Syed Mohammad Ghazi in the year 1860 did not stop her from educating herself. After mothering two daughters, Arshadunnessa and Badrunnessa, Faizunnessa became the first female poet in British India and had her first book, 'Rupjalal,' published in 1876, which was dedicated to her husband. Soon after, in 1889, Faizunnessa was given the title 'Nawab' by Queen Victoria, the first and the last female to be ever bestowed with such a title in the subcontinent

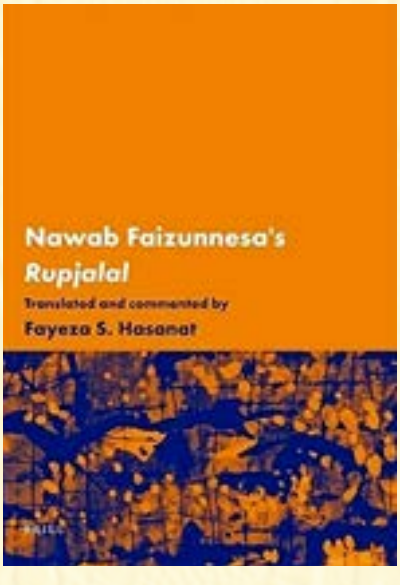

A pioneer in women's education and emancipation in this part of the world, she established the Faizunnessa English High School in Cumilla in 1873, a good seven years before the birth of Begum Rokeya. Having constructed at least 14 primary schools, several hospitals, roads, bridges and ponds, Faizunnessa was widely known for her humanitarian and charitable work. In 1894, when she had performed her hajj, Faizunnessa established a Rest House for the Hajees in Makkah and a madrasa in Madinah.

At the time when sporadic efforts were taking place to develop the condition of education in this part of the world, "a Musilm woman came forward with a daring plan to set up a school for purdanasin girls in Cumilla," writes Sonia Nishat Amin, professor of History at University of Dhaka, in her book The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939. In the chapter dedicated to Nawab Faizunnessa, 'From Andarmahal to High School: Faizunnesa's Pioneering Work,' Amin writes about how at a time when "the scions of the Muslim Awakening, Sir Syed Ahmed Khan in North India and Abdul Lateef in Bengal hardly gave the matter much thought, Faizun felt that women must be by the side of men in the path to modernity." She had also built a 10-tombed mosque and a madrasa for secondary school students in Pachimgaon, which is now known as the Nawab Faizunnessa Government College. She had also donated ten thousand takas, a huge amount back in those days, for the establishment of the Victoria College in Cumilla.

Faizunnisa had set up three categories of education - religious schools, schools for boys and schools

Govt. College

10 Tombed Mosque

for girls. She had established a free madrasa at her residence, which later on, in 1943, was converted into the Higher Secondary Islamia College and the Gazi Atia Madrasa. While establishing primary schools for boys, Faizunnisa was aided by her daughter, the famous Badrunnessa, in setting up the Nawab Faizunnessa and Badrunnessa High School for boys. The English Middle School was raised to the status of a high school under Calcutta University in 1909.

In spite of hailing from a strict Muslim background, Faizunnessa was known to have been equally supportive to the non-Muslim people living around her, especially the women. According to Sonia Amin's research, Kalicharan De, a noted Brahmon of Cumilla, aided Faizun in her efforts. Even though Faizun was renowned for her philanthropic works, her single greatest achievement was the founding of the girls' school at Kandir Par, several decades before Begum Rokeya set up hers in Calcutta, another personality who had worked to establish a strong platform for female education in Bengal. "However, most of the pupils were from Brahmo or Hindu families," writes Sonia Amin, "and it is doubtful whether any Muslim girl studied in the school till the early Twentieth century."

Nawab Faizunnessa's works in the establishment and development of education for girls exist even today, in the form of the several educational institutions which have been running successfully to date in different parts of Bangladesh and West Bengal. It is because of the likes of her that thousands of women in this part of the world have been able to taste a little bit of the freedom that they still crave for even today.

THE FAMOUS PLACES OF KISHOREGANJ

Sadia Islam Shorna
Class : Nine, Section: A, Roll : 22

Kishoreganj is a district in Dhaka Division of Bangladesh. Earlier it was a Mohokuma under the Mymensingh district.

Kishoreganj is a place of the creed of respectively Sanatana and Loukik Islam. Both Meghna and Brahmaputra river have contributed to its existence. Many traditional rituals are observed every year in kishoreganj. Among them kurikhai Mela is one of the most celebrated fairs. Many interesting places of kishoreganj are Jangalbari Fort. Egarosindur shah Mahmud Mosque etc.

Jangalbari Fort: Jangalbari Fort is situated in Jangalbari village of karimganj upazila. It was once a strong outpost of the Bengal Ruler Isa Khan. Isa khan founded several structures inside the Fort area. This fort was severely damaged by the great earthquake in 1897. Isa khan's descendants still live in this village.

Currently the fourteenth descendants of Isa Khan, Dewan Amin khan lives in the Fort.

Egarosindur: Egarosindur is a village in kishoreganj. The village is situated on the east side of the river Brahmaputra. The name of this village is found in the Akhonnama by the historian Abul Fazal. There is a debate among historians about the history of Egarosindur. It is the most beautiful place of kishoreganj.

Shah Mahmud Mosque: It is an attractive building at Egarosindur may be dated sometime around 1680 AD. The mosque stands at the back of a slightly raised platform, which is enclosed by a low wall with a gateway consists of an ablong structure with two storeyed roof. The mosque is a square structure of 5.79 m a side in the inside and is emphasized with octagonal towers on the four exteriors angles.

Saadi Mosque: Another structure of Egarosindur is one of the best conserved monuments in the country. A pertain inscription tablet fixed over the central mihrals records that the mosque was built in 1062 Alt(1652 AD) by one, Saadi's son of Sheikh Shiroo during the reign of Shahjahan. It is one of the best mosques of kishoreganj.

Fort of Isa Khan: The remaining Fort is still spot near the site of Saadi mosque. In this Fort, Isa khan fought against Mansingh, the general of Akbar. Recently some valuable antiques are also found in this place which bear the attractive history of this legendary place.

At last Kishoreganj is a famous place of Bangladesh. With proper care, it can be a prominent tourist place of interest.

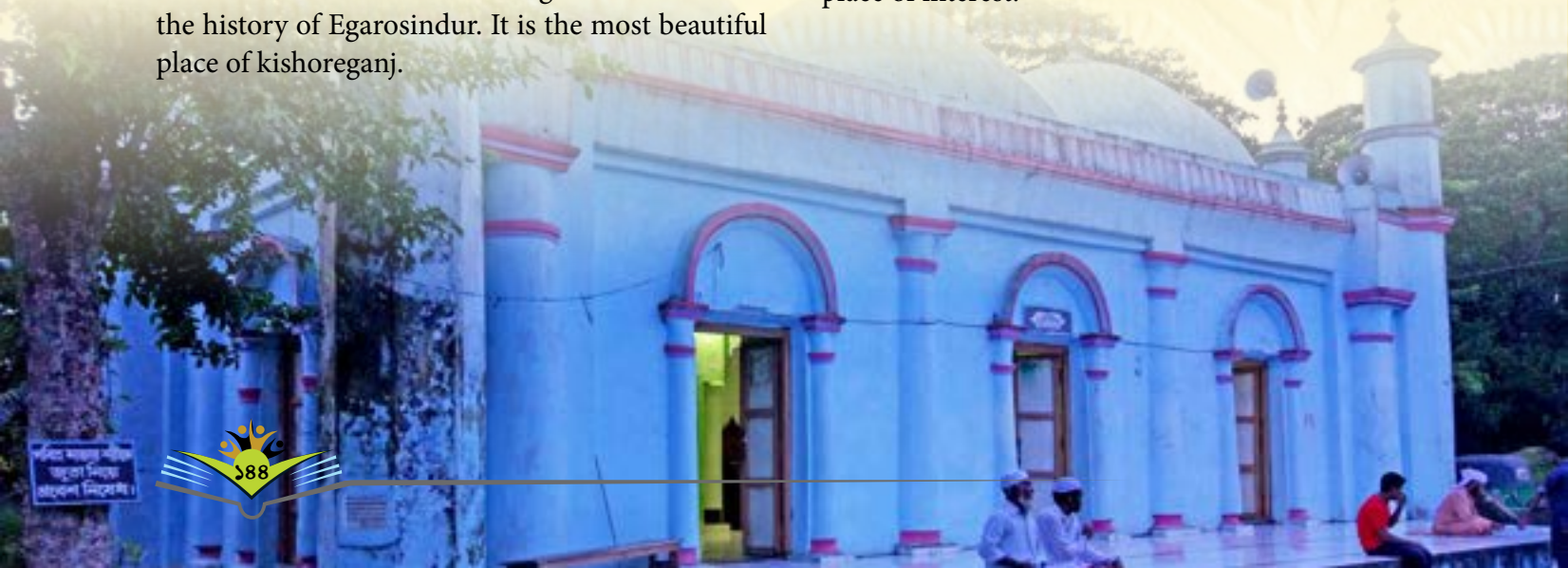

MARRIAGE CAN WAIT, EDUCATION CANNOT

Zaara Sadaf
Class : Nine, Section: D, Roll: 11

An old saying "Raising a daughter is like watering your neighbour's tree" states that it is a waste to invest in a daughter who will be lost to another family through marriage. The world has seen significant progress over the years, but there is one area that still leaves much to be desired-women's education. According to UNESCO "Despite all international and national efforts over half of children out of school are girls; 31 million girls are still out of school around the world".

Man and woman are equal and integral power for a nation. That is, education is equally essential for both. Educated women have a greater chance of escaping poverty, leading healthier & more productive lives and raising communities. They are also likely to insist on education for their own children, especially their daughters. Educated Girls can reduce infant mortality, child marriage and population explosion.

Various recent education initiatives taken by both government and NGOs have placed strong emphasis on girl's education, leading to a widely praised increase in access to it over the last ten years around the world. In fact, Bangladesh has made much progress in improving girl's decentralization under the leadership of Honourable Prime Minister Sheikh Hasina; the country is regarded as an example for the empowerment of women in the world. So, it's time to make sure a better education for every women and girls. Because empowering them means empowering world as a whole.

Police: Where do you live?
Me: With my parents

Police: Where do your parents live?
Me: With me

Police: Where do you all live?
Me: Together

Police: Where is your house?
Me: Next to my neighbour's house

Police: Where is your neighbour's house?
Me: If I tell you, you won't believe me

Police: Tell me please
Me: Next to my house

SAY 'NO' TO PLASTIC BAGS!

Anika Nawar
Class: Ten, Section-A, Roll: 159

We must stop using plastic bags for a better environment. There are various eco-friendly alternatives that can be used to stop the usage of plastic bags!

Firstly, plastic bags are a major source of plastic pollution. As they are non-biodegradable, they take years to decompose. They contribute to a lot of waste which keeps collecting over the years. Plastic takes thousands of years to break down and decompose. It remains in the land which contributes to the rising problem of land pollution.

It also causes water pollution, as people throw away the bags carelessly on the roads, in the drains and rivers, they enter the water bodies. They are carried away by winds in them and sometimes dumped into water deliberately. This plastic bag goes deep in the water and also hampers the aquatic life.

Do you know!

Plastic causes the death of animals. The animals have no sense of what to eat and what to not. The stray animals gulp down plastic bags that get stuck in their bodies. In other words this causes serious illnesses in their bodies, sometimes, they choke to death after eating plastic bags.

Avoid Plastic Bags!

Though it may be difficult to avoid plastic bags at first, it is a must to be done for the betterment. Plastic is slowly and steadily eating away our planet and damaging it. The government has banned the use of plastic bags but still people continue to use it despite the banning. In order to implement these laws strictly, the government must take strict action against the ones using it. Each of us must come forward to response to this banning and must carry cloth or paper made bags for shopping. We should try to pack our food in steel or aluminum containers instead of plastic bags that are the cause of land pollution, water pollution and soil pollution. This causes the death of several animals as well.

THE PLANETS OF THE SOLAR SYSTEM

Tahia Taskin Liya
Class: Seven, Section-E, Roll: 45

The Planets of the Solar System

There are eight planets in our Solar System. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune.

Mercury

Mercury is the smallest planet in the solar system. It orbits the sun once every 87.97 Earth Days. Being so close to the sun, the day time temperature on it is scorching-reaching over 400 Degrees Celsius. It has a very low surface gravity. There is no water on the surface of Mercury.

Venus

Venus is the sixth largest planet in the solar system. It is the hottest planet in the solar system. It takes 243 days to orbit the sun. Venus features no liquid water

Earth

The Earth is around 4.6 billion years old according to scientists. It is the dearest planet in the solar system. Earth is the fifth largest planet in the solar system. The earth's orbital speed is 29.8 km/per second. The Earth's atmosphere is composed mainly of nitrogen (78%), Oxygen(21%), Argon(.73%) and Carbondioxide (0.03%). Earth's atmosphere is divided in 5 sections from the surface: Troposphere (0.13km), Ozone Layer (13-25km), Stratosphere (25-50km), Mesosphere (50-75km) and Thermosphere (75-150km). It has one satellite - moon.

Mars

Known as 'Red Planet', Mars is characterized by its red, dusty, landscape. The atmosphere on it is very thin, composed mainly of carbondioxide (75%), nitrogen (2.7) and aregon (1.6%) with traces of oxygen and water. The orbital speed of Mars is 24.2km/per second. Temperature on it varies from 00C (320F) to-1000C (1480F). A Mars year is equal to 686-78 Earth Days. The day in Mars is equal to 24.6 Earth's Hours.

Jupiter

Jupiter is the largest planet in our solar system. The orbital speed of it is 13.1km/sec. The year on it is equal to 11.9 Earth Years. The days on Jupiter are equal to 7.8. Earth Hours. It has sixty three moons or satellites.

Saturn

Saturn is the sixth planet from the sun and second largest. Saturn has 62 known moons. The year on it is equal to 29.5 Earth years. The day on it is equal to 10 hours and 14 minutes in Earth days. It's rings are made primarily of `water ice' mixed with dust and other chemicals. The temperature on it by the clouds is at-2740F.

Uranus

Uranus is the third largest planet in the solar system. It was the first planet discovered by telescope. The day on it is equal to a little more than 17 hours on Earth the year on it is equal to 84.01 Earth Years.

Neptune

Neptune is the fourth largest planet in the solar system. It is a large water planet with a blue hydrogen methane atmosphere and faint rings. The orbital speed of it is 5.4 km/second. The day on it is equal to 16 hours in Earth time. Its one year is equal to 164.83 Earth years.

A DEPARTED SOUL

Nasrin Jahan Eva
Class: Ten, Section: A, Roll: 189

Long years ago, there was a girl who lived in a small village in Ireland. The name of this girl was Rozebel. She was very beautiful, intelligent and gentle. She helped the poor people all along. She thought and thought about the weal and woe of the village people. She also wanted to make her village as good as paradise. The people of that village were not good. They did not help each other in time of danger. After all, the condition of that village was a fish out of water. At first the people did not accept her activities. But she did not pay heed to the village people. Rather, she did many social and economic works for the improvement of the village. She taught the illiterate people. Then she taught the people about health, family planning and scientific method of cultivation. She also gave money to the poor people for the improvement of their condition. At last, the people realized that the girl wanted to do good things for the people. So they obeyed her. In the long run, the village turned into a paradise. All the people of the country praised Rozebel and her work. But all on a sudden the girl died. Everybody of that village burst into tears. They said, "We all will remember not only you but also your activities for ever."

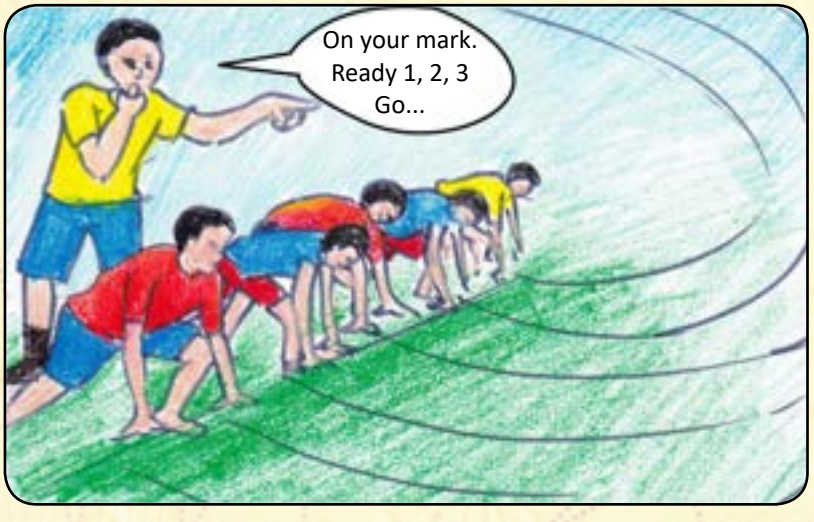

A STRANGE EXPERIENCE

Maisha Labib
Class : Nine, Section-D, Roll: 19

I just got off a train at the railway station. I was there to meet one of my friends. But the station was so crowded that I couldn't find her. As I was searching for her, I saw her sitting on a bench. She was talking to someone over the phone. So I went to her and tapped her shoulder.

"Hi Emie! Sorry for keeping you waiting. I couldn't find you anywhere," I said, but as she turned around, I realized that it wasn't my friend, Emie.

"Excuse Me! Who are you?" she asked, looking slightly annoyed. "Sorry, I thought you were my friend," I said but the woman still looked annoyed. I decided to sit down and call my friend so that I could find her.

Just as I was about to call her, the lady looked at me and declared, "You can't sit here."

"What?" I asked, not believing what I heard.

"You cannot sit here," she repeated.

"And why can't I sit here?" I asked, feeling confused.

"Because I'm making an important phone call and you are annoying me just by being here. Besides you've already interrupted me once," she said as if it were so logical.

"This is a public place! You cannot tell me to go away. I will sit wherever I wish," I told her, getting angry at her attitude.

"Now, you won't. If you do, I'll go to the police and security of the train station. I'll inform them that there is a crazy person on this station and she is disturbing me".

"But I never disturbed you! I simply mistook you as my friend," I said. Suddenly, she started yelling at me, "You will go somewhere else right now! Or else I'll go to the police! Do you know who I am?"

Her shouting attracted a lot of people; among them I spotted Emi and quickly went to her. Emi laughed at my story but agreed with me that it was quite a strange experience.

AN IMMORTAL SOUL OF THE LAND

Shahida Akhter
Assistant Teacher, English

On a flaming day of spring,
A celestial light came to the earth,
Holding a message of rebirth.
Rescued the innocents from oppressing.

He sailed the vessel of freedom,
To assure the right of the nation.
He is the symbol of hope and inspiration,
Remains immoral in every bosom.

He is second to none,
As he shed his blood,
For mapping Bangladesh in the world.
He is Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman.

DREAM IN LIFE

Masnun Mahmud Kriti
Class: Nine, Section: D,
Roll: 08

Dream doesn't come as spring,
Like carrying freedom and blessing
But it's still beneficial
Charming pleasant and potential
Settles everyone's career or aim,
And also enhances their value and fame.
Where as day dream is not as sweet as dream
So don't waste time by preferring day dream.
Falling, losing, destroying, fading
Such are the result of day dreaming
You have the control on your body, mind and brain
Don't lose
Let it not go in vain
But hoping spring to come one day,
Let your sweet dreams stay.
Be determined of your aim, goals
Engrave yourself basing ideal people's moulds.
Hold a pen, express yourself,
It's right time to establish own self.
Carve all your feelings like a writer,
It's far better than being a fighter.
To sharpen on your brain's edge,
Learn and impart your knowledge.
Turn up in your present life
Close your mind and eye from dreaming life
Your success for one moment will never stay permanent
"Happy ever after,"-make it's embankment
By far,
Reach the highest peak,
Keep it up and hold it with your beak.

PURSUING HAPPINESS

Farbeem Farian Shuddho
Class: Nine, Section: C, Roll: 17

This is the humble tale
Of an ambitious man;
Who wanted to achieve success
However he can.
He worked hard for long;
And never faltered once.
The only thing that kept him going
Was the "Happiness" hence.
But alas! along the way,
His morals started faltering.
Now; for him; doing evil
Didn't meaning anything.
After working hard for long
He achieved success
But the reason for his pursuit of success;
"Happiness"
Was never there with his praise

Then he realized the truth behind it all.
That he was chasing a mirage after all.
The "Happiness" was there with him all along.
But being foolish, he sacrificed his "Happiness".
In exchange for measly success he 'believed' he longed.
Tear gushing down his cheeks, he said,
"Oh! How I've been fooled!
for decades,
I've reminisced about the past, and dreamed about the future stars,
But I've abandoned my present.

MY MOTHER LAND

Munawara Tarannum
Class: IV, Section: F, Roll: 01

I love my mother land
She is so beautiful
And bright.

I love my mother land
She gives me home, shelter
And light.
I feel proud of her history, struggles
She is victorious
and vivid.

I love my mother land
She is very lovely
And a blessing of God.
Oh, really, I am very proud
I love my mother land
So much.

DON'T MAKE A PROMISE

Sadman Sakib
Class: Six, Section: B, Roll: 01

Don't make me a promise you can't keep.
Don't tell me things that you don't mean.
Don't whisper sweet things that I can't hear.
Don't tell me you'll meet me then not be there.
Don't give me tomorrow and leave me yesterday.
Don't give me things then ask me to pay.
Don't say you remember then forget.
Don't make me believe you then have regret.
Don't say it's the truth when it's a lie.
Don't say hello to tell me goodbye.
Don't say this is real when it makes disbelief.
Don't say how you feel then act differently.
Don't make a laugh then make me weep.
Don't make me a promise that you can't keep.

WHEN WE'LL BE DEAD

Muhammad Afrid
Class: Nine, Section: C, Roll: 82

When darkness falls, may it be,
That we should see the light
When reaper calls, may it be,
That we walk straight & right.
When doubt returns, may it be,
That faith in Allah shall demolish our scars.
When we're seduced, may it be,
That we do not deviate our cause.
All sinners, a future, all saints, a past
Beginnings, the ending, return to ash
When we'll be dead, my dear,
We have to be together
When we'll be dead, my dear,
We have to live forever.

When all is pain, may it be,
It's all we've ever known
When hell fire consumers, don't let it be,
It dissolves our dying bones
When loss has won, don't let it be,
It's my goal, I am madly fighting for
When kingdom comes, may it be,
We walk right through open door
All sinners, a future, all saints, a past
Beginnings, the ending, return to ash
When it happens, don't let it be,

It's just leading us to path of destruction
When we make it stop,
Then we'll be leading to the right path
When we can't make it stop,
Then we'll be facing for our crimes at the Judgement Day
When we'll be dead, my dear,
We have to give an explanation for our deeds
When we'll be dead, my dear,
We have to live
We have to life forever.

LIFE IS PRECIOUS

Maisha Binte Motiur
Class: Six, Section: B, Roll: 17

The gracefulness
of a butterfly,

How gentle,
And fragile they seem!
Gentle Fluttering,
On a calm Summer's day,
Floating like
A dream.
But sadly,

There time is over,
Hardly before
It begins
So enjoy
Your special moments,
Like a butterfly,
In the sun.

JOKES

Ishrat Mahsin
Class- Eight, Section- F,
Roll- 137

1.

Full meaning of SCHOOL

Six

Caring

Hours

Of

Our

Lives

2.

Teacher - Why is your paper blank?

Student- Sometimes silence is the best answer.

3.

Teacher- Why do human beings have different blood group?

Student- So that mosquitoes can enjoy different flavours.

4.

80% of the exam is based on

-1 lecture you missed

& 1 topic you didn't prepare.

5.

Teacher- Do you know child labor is a crime?

Student- If child labor is a crime then why teacher gives homework?

6.

Teacher- What is the future tense of 'I bought some food'?

Student- 'My friends ate it'.

7.

Teacher- Why fish can't talk?

Student- If I put your head under water, could you speak?

8.

Teacher- What do you mean by 'etc'?

Student- 'End of Thinking Capacity'.

9.

Sometimes Maths be like...

If the plane moves 253 km south west and the wind blows from 60^0 south east 'Calculate the age of the pilot'.

10.

Suppose,

Syllabus → A sea

How much I study → A river

How much I remember → A bucket

How much I write in exam → A glass

How much I score → One drop.

শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীলতা বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে সিপিএসসিএম এর নিয়মিত প্রকাশনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

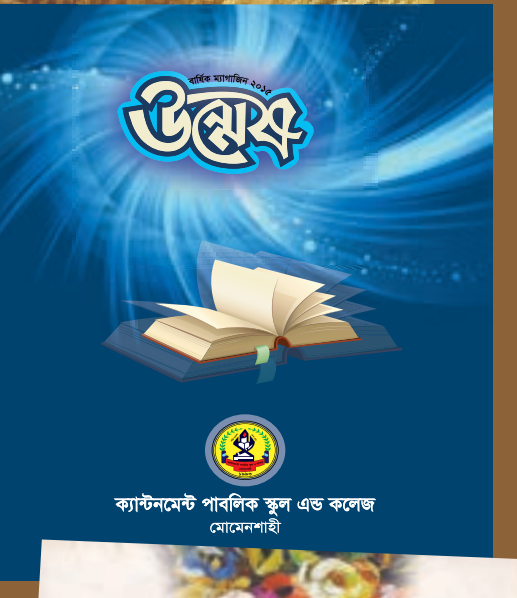

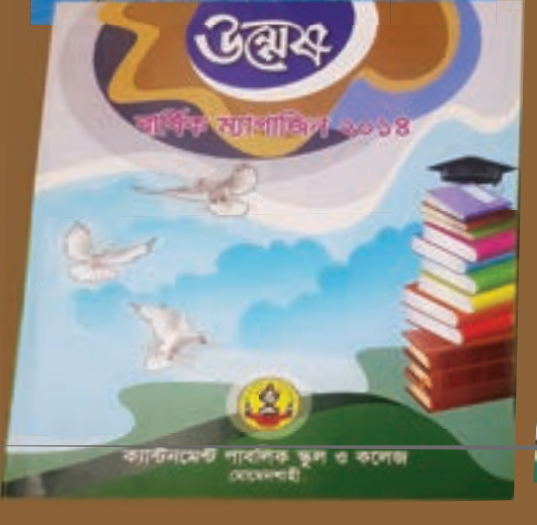

রংতুলি

আফিয়া ইবনাত হাবিব
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: এ
রোল: ১৭৪

আফিফা নওশিন
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ই
রোল: ৬২

আহনাফ রহমান খান ফাইরোজ
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ই
রোল: ৩৫

আফিসা নওরিন
শ্রেণি: কেজি, শাখা: সি
রোল: ২৪

ফাইয়াজ হক তওসিফ
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: বি
রোল: ২৩৭

আরিক আব্দুল্লাহ
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: এফ
রোল: ১২৭

ফারহান শাহরিয়ার দিব্য
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ই
রোল: ৪৪

ফারজানা সিদ্দিকা তমা
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: বি
রোল: ০৪

জাহিদ হাসান ফাহিম
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: এ
রোল: ২২৯

জাইফ তালূকদার
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: এ
রোল: ৪০

কাজি শাহজাদ নাফিও
শ্রেণি: ১ম, শাখা: সি
রোল: ৬২

কাজী শাহরিয়ার লাবিব
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ই
রোল: ৩৪

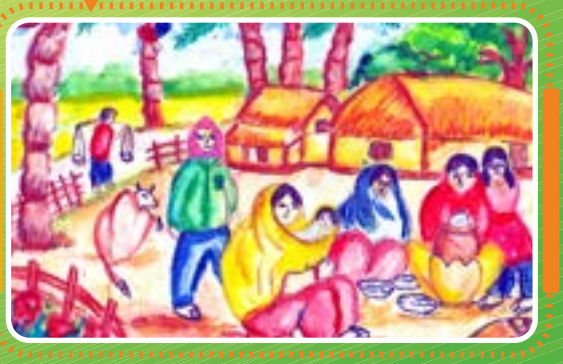

কেফায়েত উল্লাহ
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: এফ
রোল: ৯৪

খান মো. সাকুর আশফাক আলাম
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: এ
রোল: ১০০

খন্দকার মাহজাবিন নিধি
শ্রেণি: ২য়, শাখা: এ
রোল: ৫৮

মাশরুফা আক্তার
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: বি
রোল: ৫৮

মিথিলা মুনতাহা
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: এ
রোল: ১০৯

মুহতাদি আল মুইদ তালুকদার জাওয়াদ
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: গ
রোল: ২৯

মোনাওয়ারা তারান্নুম
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: এফ
রোল: ১

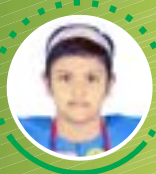

নাজিবা ওয়াজিহা
শ্রেণি: ২য়, শাখা: সি
রোল: ৩০

নুসরাত জাহান মাইশা
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: এ
রোল: ৫৩

নাহিদুল ইসলাম
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: বি
রোল: ৮

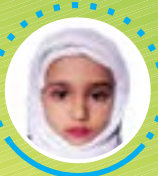

নুজহাত মালিয়াত সামিহা
শ্রেণি: কেজি, শাখা: ই
রোল: ১৯৪

রেজওয়ান সিকদার
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: এফ
রোল: ৪৯

সাবিহ্ ওজায়ের নোয়াজ আয়ান
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ই
রোল: ১৪

শাফায়েত সামি
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ই
রোল: ৫৯

সাইফুর রহমান সিয়াম
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: বি
রোল: ১১৫

সালভিয়া আলম সানিয়া
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: বি
রোল: ৯১

শেহজাদ আলম আরাবি
শ্রেণি: নার্সারি, শাখা: সি
রোল: ১৬৫

সুমাইয়া আফরিন লোভা
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: বি
রোল: ৯৬

তাফসিরুল তানজিম তাহিম
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ডি
রোল: ৫১

তাহিয়াত চৌধুরী
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ডি
রোল: ২৯

তাহমিদ আরাবি সোয়াদ
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ই
রোল: ৩২

তাইয়েবা সারিকা
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ডি
রোল: ১৬৩

তামিম আহমেদ
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ই
রোল: ৫২

তানজিম আল তাহসিন অর্ণব
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ই
রোল: ৮২

আলোর পথের যাত্রী

শ্রেণিভিত্তিক ছবি

ফাহিমা নাছরিন
শ্রেণিশিক্ষক
নার্সারি- ক শাখা

রওশন আরা
শ্রেণিশিক্ষক
নার্সারি- খ শাখা

রওশন আরা
শ্রেণিশিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)
নার্সারি- গ শাখা

অরুপা ঠাকুর শিল্পী
শ্রেণিশিক্ষক
নার্সারি- ঘ শাখা

আয়েশা আক্তার রুমা
শ্রেণিশিক্ষক
নার্সারি- ঙ শাখা

রুমানা ইফফাত
শ্রেণিশিক্ষক
নার্সারি- চ শাখা

রোকসানা পারভীন
শ্রেণিশিক্ষক
কেজি- ক শাখা

স্বদেশ কুমার দত্ত
শ্রেণিশিক্ষক
কেজি- খ শাখা

মো. সাইফুল ইসলাম সুজন
শ্রেণিশিক্ষক
কেজি- গ শাখা

মো. নজরুল ইসলাম-১
শ্রেণিশিক্ষক
কেজি- ঘ শাখা

মো. জসিম উদ্দিন
শ্রেণিশিক্ষক
কেজি- ঙ শাখা

মো. মঞ্জুরুল হক
শ্রেণিশিক্ষক
কেজি- চ শাখা

স্বপ্না রানী দাস
শ্রেণিশিক্ষক
প্রথম- ক শাখা

মাহাবুবা আফরোজ
শ্রেণিশিক্ষক
প্রথম- খ শাখা

মো. নজরুল ইসলাম-২
শ্রেণিশিক্ষক
প্রথম- গ শাখা

এনায়েত উল্লাহ
শ্রেণিশিক্ষক
প্রথম- ঘ শাখা

মো. আবু জাকারিয়া
শ্রেণিশিক্ষক
প্রথম- ঙ শাখা

মো. সুজন মিয়া
শ্রেণিশিক্ষক
দ্বিতীয়- ক শাখা

মো. আমিনুল ইসলাম
শ্রেণিশিক্ষক
দ্বিতীয়- খ শাখা

রেহানা পারভীন
শ্রেণিশিক্ষক
দ্বিতীয়- গ শাখা

সাহিদা আক্তার
শ্রেণিশিক্ষক
দ্বিতীয়- ঘ শাখা

ফিরোজ
শ্রেণিশিক্ষক
দ্বিতীয়- ঙ শাখা

মো. শাহজালাল মিয়া
শ্রেণিশিক্ষক
তৃতীয়- ক শাখা

সুমাইয়া আফরিন আফসানা
শ্রেণিশিক্ষক
তৃতীয়- খ শাখা

নাহিদা আফরোজ
শ্রেণিশিক্ষক
তৃতীয়- গ শাখা

সাবিহা রহমান
শ্রেণিশিক্ষক
তৃতীয়- ঘ শাখা

খন্দকার মৌসুমী নাসরিন
শ্রেণিশিক্ষক
তৃতীয়- ঙ শাখা

মো. সেলিম উদ্দিন
শ্রেণিশিক্ষক
তৃতীয়- চ শাখা

সোহাগ মনি দাস
শ্রেণিশিক্ষক
চতুর্থ- ক শাখা

মাঈন উদ্দীন আহামেদ মাহী
শ্রেণিশিক্ষক
চতুর্থ- খ শাখা

জুয়েনা জাহান এ্যানি
শ্রেণিশিক্ষক
চতুর্থ- গ শাখা

মো. মাহবুব রহমান ফকির
শ্রেণিশিক্ষক
চতুর্থ- ঘ শাখা

মো. আল আমিন
শ্রেণিশিক্ষক
চতুর্থ- ঙ শাখা

মো. লিয়াকত আলী খান
শ্রেণিশিক্ষক
চতুর্থ- চ শাখা

ফৌজিয়া বেগম
শ্রেণিশিক্ষক
পঞ্চম- ক শাখা

শামস বিন বনি আমিন
শ্রেণিশিক্ষক
পঞ্চম- খ শাখা

একেএম খায়রুল হাসান আকন্দ
শ্রেণিশিক্ষক
পঞ্চম- গ শাখা

বিদ্যুৎ তরফদার
শ্রেণিশিক্ষক
পঞ্চম- ঘ শাখা

মো. মাজাহারুল ইসলাম
শ্রেণিশিক্ষক
পঞ্চম- ঙ শাখা

আব্দুর রহমান
শ্রেণিশিক্ষক
পঞ্চম- চ শাখা

জুলেখা আখতার
শ্রেণিশিক্ষক
ষষ্ঠ- ক শাখা

মো. নূরুল ইসলাম
শ্রেণিশিক্ষক
ষষ্ঠ- খ শাখা

ফাতেমা উম্মে রায়হান
শ্রেণিশিক্ষক
ষষ্ঠ- গ শাখা

সঞ্জয় বিশ্বাস
শ্রেণিশিক্ষক
ষষ্ঠ- ঘ শাখা

জাহাঙ্গীর আলম
শ্রেণিশিক্ষক
ষষ্ঠ- ঙ শাখা

কাজী সুমন প্রিয়া
শ্রেণিশিক্ষক
ষষ্ঠ- চ শাখা

ইলোরা ইমাম সম্পা
শ্রেণিশিক্ষক
সপ্তম- ক শাখা

ফাতেমা খাতুন
শ্রেণিশিক্ষক
সপ্তম- খ শাখা

ফজলে মাসুদ
শ্রেণিশিক্ষক
সপ্তম- গ শাখা

মাসুদ রানা
শ্রেণিশিক্ষক
সপ্তম- ঘ শাখা

সিদ্দিকা আক্তার জাহান
শ্রেণিশিক্ষক
সপ্তম- ঙ শাখা

মো. আমিরুল ইসলাম
শ্রেণিশিক্ষক
সপ্তম- চ শাখা

মো. ওমর ফারুক
শ্রেণিশিক্ষক
অষ্টম- ক শাখা

কে. এ. এম রাশেদুল হাসান
শ্রেণিশিক্ষক
অষ্টম- খ শাখা

মো. মনোয়ার হোসেন
শ্রেণিশিক্ষক
অষ্টম- গ শাখা

আ ন ম মাহমুদুল হাসান
শ্রেণিশিক্ষক
অষ্টম- ঘ শাখা

এম এ বারী রব্বানী
শ্রেণিশিক্ষক
অষ্টম- ঙ শাখা

ফারিজা জামান
শ্রেণিশিক্ষক
অষ্টম- চ শাখা

রোমানা হামিদ
শ্রেণিশিক্ষক
নবম- ক শাখা

মাহবুবা নুরুন্নেছা
শ্রেণিশিক্ষক
নবম- খ শাখা

এ কে এম শহীদ সারওয়ার
শ্রেণিশিক্ষক
নবম- গ শাখা

মো. আবদুল অহিদ
শ্রেণিশিক্ষক
নবম- ঘ শাখা

রোকসানা বেগম
শ্রেণিশিক্ষক
নবম- ঙ শাখা

মো. সিরাজুল ইসলাম
শ্রেণিশিক্ষক
নবম- চ শাখা

রুবাইদা বিন্‌তে রহমান
শ্রেণিশিক্ষক
দশম- ক শাখা

শিরীন আক্তার
শ্রেণিশিক্ষক
দশম- খ শাখা

রেহানা সুলতানা
শ্রেণিশিক্ষক
দশম- গ শাখা

মুহাম্মদ কামাল হোসাইন
শ্রেণিশিক্ষক
দশম- ঘ শাখা

নয়ন তারা
শ্রেণিশিক্ষক
দশম- ঙ শাখা

মোহাম্মদ ফারুক মিঞা
শ্রেণিশিক্ষক
দশম- চ শাখা

সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু
শ্রেণিশিক্ষক
একাদশ- এ শাখা

সাবিনা ফেরদৌসি
শ্রেণিশিক্ষক
একাদশ- বি শাখা

মো. আনিসুজ্জামান রানা
শ্রেণিশিক্ষক
একাদশ- সি শাখা

সৈয়দ কাদিরুজ্জামান
শ্রেণিশিক্ষক
একাদশ- ডি শাখা

মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন
শ্রেণিশিক্ষক
একাদশ- ই শাখা
(ইংলিশ ভার্সন)

হোসনে আরা জেছমিন
শ্রেণিশিক্ষক
একাদশ- এফ শাখা

সুলতান আহমেদ
শ্রেণিশিক্ষক
একাদশ- জি শাখা

নাসরিন পারভীন
শ্রেণিশিক্ষক
একাদশ- এইচ শাখা

এস.এম. জাহিদুজ্জামান
শ্রেণিশিক্ষক
একাদশ- আই শাখা

মো. মশিউর রহমান
শ্রেণিশিক্ষক
একাদশ- জে শাখা

নাহিদ আরা
শ্রেণিশিক্ষক
দ্বাদশ- এ শাখা

আনজুমান আরা
শ্রেণিশিক্ষক
দ্বাদশ- বি শাখা

মো. ইনামুল হক
শ্রেণিশিক্ষক
দ্বাদশ- সি শাখা

মো. মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী
শ্রেণিশিক্ষক
দ্বাদশ- ডি শাখা

সাবিনা ফেরদৌসি
শ্রেণিশিক্ষক
দ্বাদশ- ই শাখা
(ইংলিশ ভার্সন)

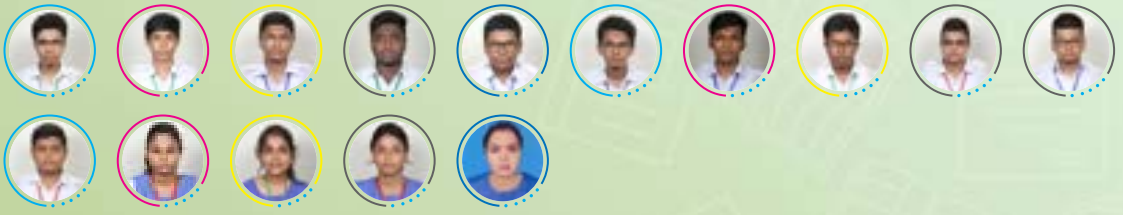

মো. আবু সাঈদ
শ্রেণিশিক্ষক
দ্বাদশ- এফ শাখা

মো. তারিকুল গণি
শ্রেণিশিক্ষক
দ্বাদশ- জি শাখা

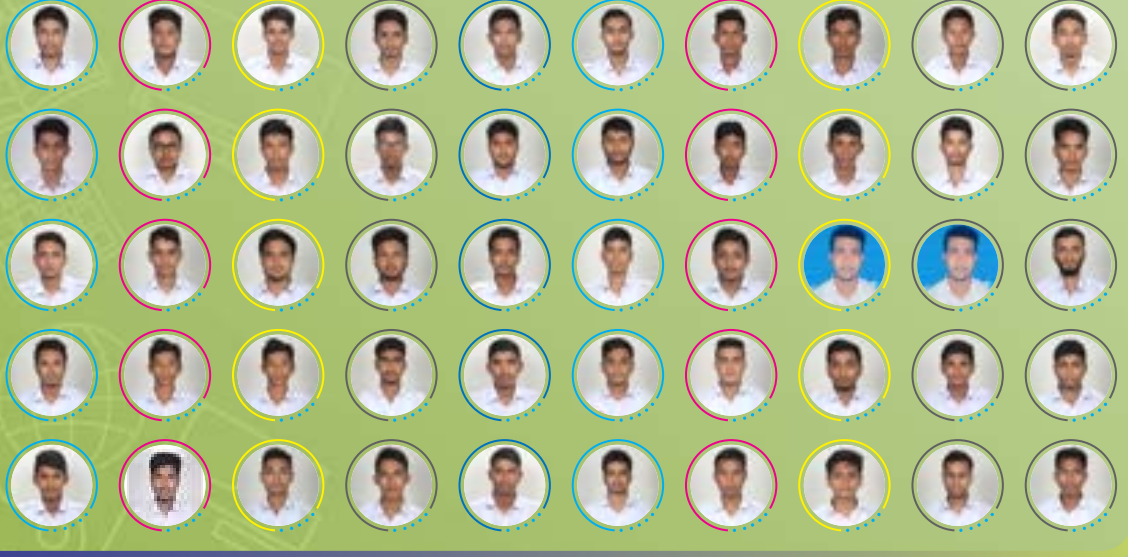

মো. শাহীদুল ইসলাম
শ্রেণিশিক্ষক
দ্বাদশ- এইচ শাখা

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় গ্রুপ ছবি এভাবে সাজানো হয়েছে।
-সম্পাদক

অ্যালবাম

একাডেমিক সাফল্য

পিইসিই-২০১৯ এ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের উল্লাস

করোনাকালীন প্রকাশিত এসএসসি ২০২০-এ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত উল্লসিত কৃতী শিক্ষার্থীদের একাংশ

পরিদর্শন

প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, এসপিপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি মহোদয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

সাবেক প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান শামীম, বিপি, এনডিসি, পিএসসি মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা

প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক, বিএসপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি-কে ফুলেল শুভেচ্ছা

সাবেক প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহোদয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম পরিদর্শন

সভাপতি মহোদয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

জাতীয় দিবস

জাতিসত্তার বিকাশ ও দেশপ্রেমে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণে প্রতি বছর জাতীয় দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৯

সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার একটি মুহূর্ত

রং তুলিতে সশস্ত্র বাহিনী দিবস

বিভিন্ন প্রতিযোগিতা পরিদর্শনে সাবেক অধ্যক্ষ

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান

রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একাংশ

বিজয় দিবস ২০১৯

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের শুভাগমন

দর্শক গ্যালারিতে অতিথি ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান ও নৃত্যে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী

বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সাথে সাবেক অধ্যক্ষ মহোদয়ের ফটোসেশন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০

২১ এর প্রভাতফেরি

শহিদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণে সাবেক অধ্যক্ষসহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন

প্রতিযোগিতায় বিজয়ী খুদে শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সাবেক অধ্যক্ষ

বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সাথে সাবেক অধ্যক্ষ

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২০

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ র‍্যালি

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ করছেন সাবেক অধ্যক্ষ

আলোচনা সভায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

জাতীয় শোক দিবস ২০২০

জাতীয় শোক দিবস-২০২০ এর ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অধ্যক্ষ
লেঃ কর্নেল মো. নাজিব মাহমুদ সজিব, পিএসসি, জি, আর্টিলারি

জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

ভার্চুয়াল আবৃত্তি
প্রতিযোগিতা

হামদ ও নাত প্রতিযোগিতা

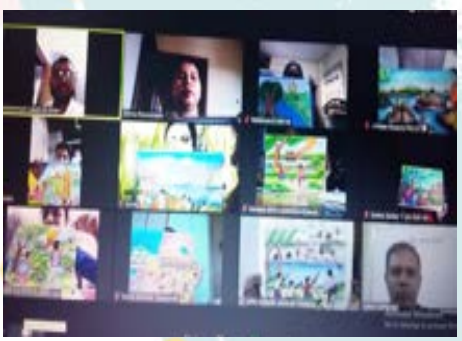

শোক দিবসে রেখা
ও রং-তুলিতে
জাতির জনকের
প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২০

প্রধান অতিথি মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান শামীম, বিপি, এনডিসি, পিএসসি, জিওসি, ১৯ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, ঘাটাইল এরিয়া এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছে প্রতিষ্ঠানের খুদে শিক্ষার্থী

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের আগমন

মশাল প্রজ্বলনে প্রধান অতিথি

সমাপনী দিবসের শুভ উদ্বোধন

সম্মানিত অতিথিবৃন্দের একাংশ

সম্মিলিত কুচকাওয়াজ এর অভিবাদন গ্রহণ

বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগীদের প্রাণবন্ত লড়াই

আন্তঃহাউস বার্ষিক
ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২০

যেমন খুশি তেমন সাজ

বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ ও বর্তমানের প্রতিফলনে মনোমুগ্ধকর গ্রুপ ডিসপ্লে

বাংলার ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রূপায়ণে শিক্ষার্থীদের প্রয়াস

বিশেষ অতিথি কর্তৃক পুরস্কার প্রদান

প্রধান অতিথির নিকট থেকে রানার আপ ঈশা খাঁ হাউস দলের ট্রফি গ্রহণ

প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির সাথে চ্যাম্পিয়ন জয়নুল হাউস এর ক্রীড়াবিদরা

তিনদিন ব্যাপী প্রতিযোগিতার শুভ সমাপ্তি করছেন সম্মানিত প্রধান অতিথি

ইনডোর ও আউটডোর গেমস

দাবা ও বাগাডুলি প্রতিযোগিতায় মগ্ন খুদে শিক্ষার্থীরা

আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন প্রতিষ্ঠানের সাবেক অধ্যক্ষ

ফুটবল খেলার একটি উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত

আন্তঃহাউস হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা

ইনডোর ও আউটডোর গেমস

বাস্কেট বল খেলার একটি উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত

আন্তঃহাউস ভলিবল খেলায় অংশগ্রহণকারীদের প্রাণবন্ত লড়াই

প্রমিলা ক্রিকেট খেলায় পিছিয়ে নেই সিপিএসসিএম এর শিক্ষার্থীরা

হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় মেয়েদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ

আন্তঃস্কুল হ্যান্ডবল (বালিকা) প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন সিপিএসসিএম দল

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ সংসদীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৯ এ কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি গ্রহণ করছে সিপিএসসিএম দল

বিজয়ের স্মরণীয় মুহূর্তগুলো

আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৯ এ কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া কৃতী বিতার্কিকদের সাথে প্রাক্তন অধ্যক্ষ

বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক আয়োজিত-ইংরেজি বিতর্কে অংশগ্রহণকারী সিপিএসসিএম দল

জেলা পুলিশ কর্তৃক আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৯ এ কলেজ পর্যায়ে বিজয়ী দলের পুরস্কার গ্রহণ করছে সিপিএসসিএম দল

যুক্তিতর্কে মেধাকে শাণিত করার লক্ষ্যে আন্তঃহাউস বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

আন্তঃহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর নৃত্য পরিবেশন

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও বিচারকবৃন্দ

একক সংগীত প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীর পরিবেশনা

উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

সেমিনার অন ক্যারিয়ার বিল্ডিং

প্রেষণামূলক বক্তব্য রাখছে ঢাবি'র ছাত্র সিপিএসসিএম এর সাবেক শিক্ষার্থী রবিউল ইসলাম

মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত প্রতিষ্ঠানের সাবেক শিক্ষার্থী-কে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সাবেক অধ্যক্ষ

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করছেন "10 minutes School" এর প্রতিষ্ঠাতা আয়মান সাদিক

সভা সমাবেশ

পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সভা

অভিভাবকদের সাথে মত বিনিময় করছেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সভাপতি

অভিভাবক সমাবেশে আমন্ত্রিত অভিভাবকবৃন্দ

শিক্ষকবৃন্দের নিয়মিত সভা

শিক্ষাসফর

উত্তেজনাপূর্ণ রাইড শান্তা মারিয়ায় উপভোগরত শিক্ষার্থীরা

শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন সাবেক অধ্যক্ষ

ওয়াটার কিংডমে শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস

শিক্ষাসফরে সাংস্কৃতিক পর্বে নৃত্যরত শিক্ষার্থীবৃন্দ

ফ্যান্টাসি কিংডমে শিক্ষাসফরে প্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখার শিক্ষার্থীরা দিনশেষে ঘরে ফেরার পূর্বে

টিচার্স পিকনিক

ড্রিমল্যান্ড পার্ক ময়মনসিংহে প্রবেশের মুহূর্তে

মিনি ফুটবলে মেতেছেন শিক্ষকবৃন্দ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকসারিতে সপরিবার
পরিচালনা পর্ষদ সদস্য,অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষকপরিবারের প্রাণবন্ত পরিবেশনা

ছোট্টমণিদের শুভেচ্ছা উপহার প্রদান

টিচার্স নাইট

টিচার্স নাইটে শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষকবৃন্দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সভাপতি মহোদয়

আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি

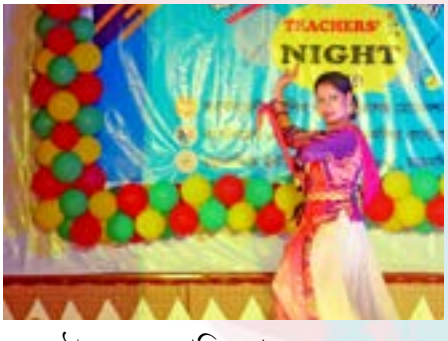

অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন স্কুল শাখার শিক্ষক ইলোরা ইমাম শম্পা

দ্বৈত সংগীত পরিবেশন করছেন দুজন শিক্ষক

সাংস্কৃতিক পর্বে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের সাথে অতিথিবৃন্দ

বিবিধ

নতুন বছরের নতুন বই

শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে অসহায় ও ছিন্নমূল শিশুদের মাঝে খাদ্য বিতরণ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ময়মনসিংহ এর সম্মানিত চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে অধ্যক্ষ

কেক কেটে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের শুভাগমন।

করোনাকালীন সিপিএসসিএম এর অনলাইন কার্যক্রম

অধ্যক্ষ কর্তৃক অনলাইন ক্লাস মনিটরিং

করোনাকালে অনলাইন ক্লাস নিচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক

অনলাইন অভিভাবক সমাবেশ

অনলাইন ক্লাসে শিক্ষার্থীদের একাংশ

করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রচারণায় সিপিএসসিএম পরিবার

একাদশ শ্রেণির ভর্তি ও ওরিয়েন্টেশন

স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ

ভর্তি কার্যক্রমে নবাগত শিক্ষার্থী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ

অনলাইনে একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশনে বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যক্ষ

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী নবাগত শিক্ষার্থীদের একাংশ

বিদায় সংবর্ধনা

বিদায়ী প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান শামীম, বিপি, এনডিসি, পিএসসি মহোদয়-এর বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সহকারী অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু

বিদায়ী বক্তব্যে পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এইচ এম মাশীহুর রাহমান, এসপিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

বিদায়ী সভাপতি মহোদয়কে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করছেন সাবেক অধ্যক্ষ

বিদায়ী অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, পিবিজিএম, পিএসসি কে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করছেন পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক, বিএসপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

বিদায়ী অধ্যক্ষকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

শেকড়ের কথা

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

উত্তরে গারো পাহাড় বেষ্টিত, প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র বিধৌত জনপদ মহুয়া-মলুয়া, ঈশা খাঁ - কেনারামের স্মৃতিধন্য পূণ্যভূমি এই ময়মনসিংহ। একদিকে এ জেলার যেমন রয়েছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, অপরদিকে রয়েছে শিক্ষানগরী হিসেবে ঐতিহ্য ও সুখ্যাতি।

শিক্ষা-সংস্কৃতিবান্ধব এ অঞ্চলের সচেতন জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে ১৯৯৩ সালের ৪ মার্চ ময়মনসিংহ সেনানিবাসের দক্ষিণ - পশ্চিম প্রান্তে প্রায় পাঁচ একর জায়গা নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহীর স্কুল শাখা যাত্রা শুরু করে। বর্তমান স্কুল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, বীর বিক্রম। ক্রমোন্নয়নের পথ ধরে ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠানটির কলেজ শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। কলেজ শাখার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, বীর বিক্রম। ২০০৭ সালে ইংলিশ ভার্সন স্কুল শাখা এবং ২০১২ সালে ইংলিশ ভার্সন কলেজ শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে স্কুল এবং কলেজ শাখায় ১১৭ জন শিক্ষক ও ৪৩২৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ বিদ্যায়তন পাঠ্যক্রম এবং সহপাঠক্রমের বিবিধ শাখায় মান ও গুণের বিচারে অভিজাত অবস্থান বজায় রেখে চলেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি ২০০৮ সালে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গৌরব অর্জন করে। এছাড়াও ঢাকা শিক্ষাবোর্ডে মেধাস্থানসহ ময়মনসিংহ জেলায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে একাধিকবার। কেবল একাডেমিক ফলাফলেই নয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একাধিকবার বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ডে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছে। ২৭ বছরের পথ চলায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এ বিদ্যায়তন শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আপোষহীন এবং জ্ঞানের বাতিঘর হিসেবে প্রাচীন এ জনপদে আলো ছড়িয়ে চলেছে।

আন্তঃক্যান্টনমেন্ট সংসদীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৯ এ কলেজ পর্যায়
চ্যাম্পিয়ন সিপিএসসিএম দল ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ